রহস্য
রোমাঞ্চ
অজেয় রায়

অজেয় রায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড
[স্থাপিত ১৯৪০]
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড : : কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম
সংস্করণ :
৭ই ফাল্গুন
১৩৯০
টা. ১০.০০

অলংকরণ :
সত্যজিৎ রায়
প্রচ্ছদ :
রাহুল
মজুমদার

প্রকাশন : কনকপ্রভা বসু
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

মুদ্রণ : লীলা ঘোষ, তাপসী প্রিন্টার্স
৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা-৬

- বটুকবাবুর ছুরি
- বাতিঘরের বিভীষিকা
- ছিরু হরবোলার ডাক
- নারাণ বহুরূপীর নতুন সাজ
- প্রতিদ্বন্দ্বী
- মণ্ডের চুনি

উৎসর্গ

স্নেহের : অপর্ণা, অমিত, অলকা, অঞ্জনাকে

—দাদা
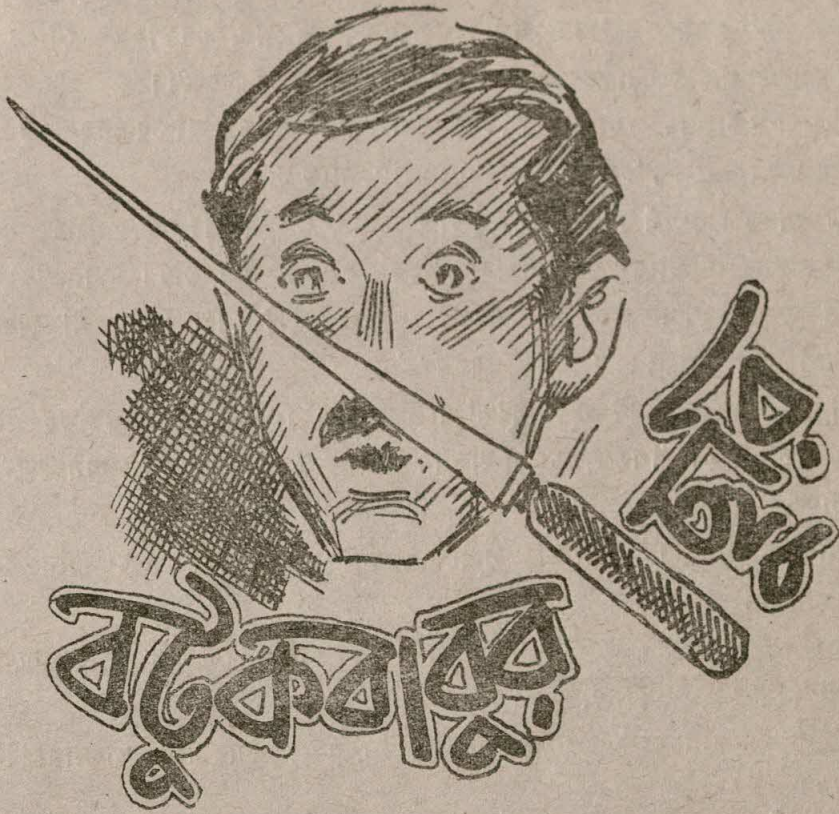
চোরাবাজার থেকে বেরিয়ে হ্যারিসন রোডে এসে দাঁড়ালেন বটুকবাবু। মাঝে মাঝে অফিস ফেরতা তিনি এই বাজারে এসে ঢু মেরে যান। এখানে বেশির ভাগই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিস, কাজেই নতুনের চেয়ে দাম কম। অনেক সময় রীতিমত সস্তাই মেলে। বটুকবাবু চোরাবাজারে এসে টুকিটাকি জিনিস দেখেন। কেনাকাটি করেন কদাচিৎ, তবে দাম-টামগুলো ধারণা করে রাখেন। ভবিষ্যতে সুবিধে হলে কেনা যাবে!

আজ কিন্তু সত্যি একটা জিনিস কেনার ইচ্ছে ছিল। একটা ছুরি। একখানা ছুরি ছিল তাঁর ; বহু বছর ব্যবহারে ক্ষীণ হয়ে গতকাল সেটি একখণ্ড শক্ত পিজবোর্ড কাটতে গিয়ে দেহরক্ষা করেছে। একেবারে মাঝখান থেকে দু-আধখানা।

কয়েকটা ছুরি দর-দস্তুর করলেন বটুকবাবু ; কিন্তু কেনা হয়ে উঠল না শেষ পর্যন্ত। যেটা পছন্দ হল, দাম পোষাল না। আর কম দামী জিনিস যা দেখলেন তা মনে হল টিকবে না বেশিদিন।

বড়রাস্তার ফুটপাথ বেয়ে বটুকবাবু অল্প কিছুদূর এগিয়েছেন এমন সময় কে একজন খাটো গলায় তাঁর খুব কাছ থেকে ডেকে বলল, 'ছুরি নেবেন স্যার? ভাল ছুরি আছে।'

বটুকবাবু চমকে তাকালেন।

বছর ষোল-সতেরোর একটা ছেলে। পরনে নীল রঙের হালফ্যাসানী ট্রাউজার্স এবং চকরা বকরা হাওয়াই সার্ট। সার্টের অর্ধেক বোতাম খোলা। পায়ে রবারের চপ্পল, চুলে বাহারে টেরি। শীর্ণ মুখে পানের ছোপ ধরা একসারি এবড়ো খেবড়ো দাঁত বের করে, ধূর্ত হাসল ছেলেটা।

একদম বখাটে টাইপ। ছোকরা পকেটমার গোছের কিছু হওয়া আশ্চর্য নয়। বটুকবাবু আড়ষ্ট হয়ে থতমত খেয়ে আওড়ালেন, 'হ্যাঁ মানে ছুরি···একটা···আছে ছুরি?'

ছেলেটা আরও কাছে ঘেঁষে এল। সে দু-হাত জড়ো করে বটুকবাবুর বুকের কাছে তুলল, এবং প্রায় ম্যাজিকের মতো তার হাতের চেটোর মধ্যে আবির্ভূত হল একখানা ছুরি। সে তার দেহ দিয়ে ছুরিটা আড়াল করে দাঁড়াল, যাতে চলমান পথচারীর কৌতূহলী দৃষ্টি সেটা সহজে না দেখতে পায়। তারপর নিচু গলায় বলল, 'দারুণ চাকু স্যার। দেখুন—'

ছুরিখানা এক নজরে দেখেই বটুকবাবুর ধারণা হল—চমৎকার জিনিস। অন্তত ছয় ইঞ্চির বেশি লম্বা ফলাটা চকচক করছে। পিতলের চওড়া হাতল। এ বস্তুর ঢের দাম। তবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কত?'

'দশ টাকা।'

ছেলেটা ইতিমধ্যে মুঠোর ভিতর ছুরি লুকিয়ে ফেলেছে! সে কেমন সন্ত্রস্তভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক সেদিক চাইছে।

দশটাকা দেওয়ার সঙ্গতি নেই বটুকবাবুর, কিন্তু এ ছুরির দাম ওর চেয়ে খুব কমবে বলে মনে হয় না। তিনি মাথা নেড়ে বললেন, 'নাঃ, থাক।'

'কত দেবেন?' অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল ছেলেটা। যেন তার ভারি গরজ, ছুরিখানা বিদায় করতে পারলে সে বাঁচে।

বটুকবাবু দুম্ করে বলে বসলেন, 'দুই।'

ছেলেটা হাঁ হয়ে গেল। বলল, 'সে কি? জিনিসটা দেখুন। বাজারে কি দাম হবে জানেন?'

'না ভাই, পারব না।'

ছেলেটা হতাশ ভাবে বলল, 'আচ্ছা আর দু-টাকা দিন।'

'আর একটা টাকা দিতে পারি। তার বেশি নয়।'

'তাই দিন।'

বটুকবাবু পকেট থেকে তিনটে টাকা বের করামাত্র ছেলেটা তা ছোঁ মেরে নিয়ে তাঁর হাতে ছুরিটা গুঁজে দিল।

বটুকবাবু কেমন দ্বিধায় পড়লেন। এত সস্তায় দিয়ে দিল—জিনিসটা সত্যি ভালত? না ভুল করলাম? আমতা আমতা করে বললেন, 'ছুরিটা ভাল হবে তো? বেশ কাটা-টাটা যাবে তো? টিকবে তো?'

ছেলেটা যাবার জন্য মুখ ঘুরিয়েছিল, এবার সে ফিরে দাঁড়াল। তার মুখে বাঁকা হাসি। সে চাপা স্বরে বলল, 'জরুর কাটা যাবে স্যার! কার হাতের চাকু জানেন?'
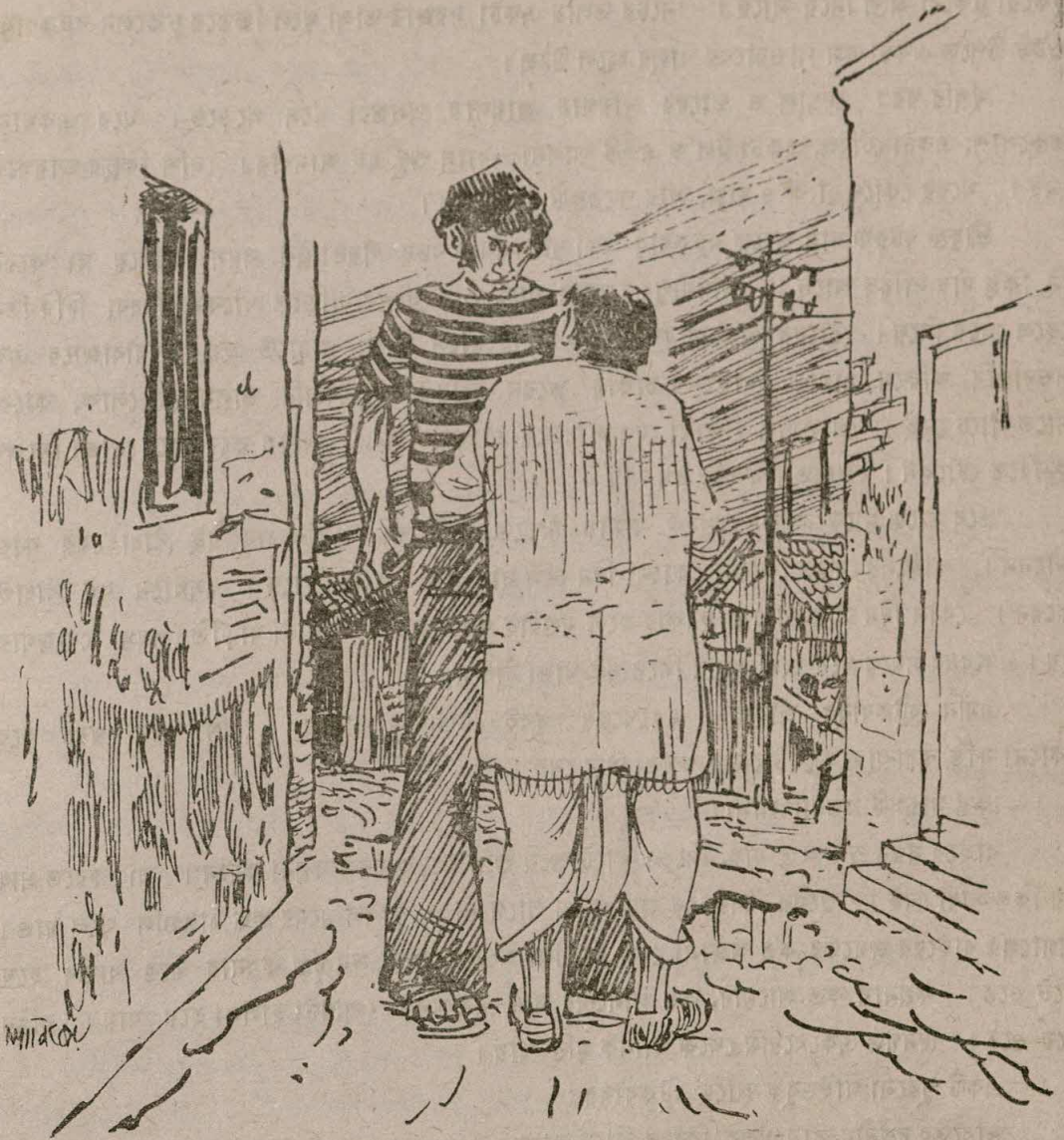
কথাটা বলে সে বিচিত্র এক ভঙ্গি করল, এবং পরক্ষণেই ঘুরে দ্রুত মিলিয়ে গেল ভিড়ের মাঝে।

বটুকবাবু কয়েক মূহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি বোঝাতে চাইল ছেলেটা? যাকগে ভেবে লাভ নেই। ছুরিখানা পকেটে ফেলে তিনি তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করলেন।

অনেকখানি হেঁটে খানিক বাসে চড়ে, অবশেষে বটুকবাবু যখন কালীঘাটে তাঁর বাসায় পৌঁছলেন তখন সন্ধ্যা নেমেছে।

একটা প্রকাণ্ড পুরানো আমলের ইট বের করা বাড়ি। একগাদা ভাড়াটে, পায়রার খোপের মতো

টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে আছে। নিচের তলায় একটা দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকলেন বটুকবাবু। সুইচ টিপতে একটা কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে উঠল।

খুপরি ঘর। দেয়াল ও ছাদের জায়গায় জায়গায় পলস্তরা খসে পড়েছে। ঘরে একখানা তক্তপোশ, একটা টেবিল, একটা টুল ও একটি আলনা—ব্যাস্ শুধু এই আসবার। বেশি কিছুর জায়গাও নেই। ঘরের কোণে ট্রাংক ও বাক্স, আর কয়েকটি বাসন-পত্র।

শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দাস ওরফে বটুকবাবু একা থাকেন। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স। বিয়ে থা করেন নি, কিন্তু দায় দায়িত্ব আছে। মেদিনীপুর জেলার গ্রামে তাঁর দেশের বাড়িতে থাকেন বিধবা দিদি তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে। তাদের ভার বটুকবাবুর। মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হয়। বৌবাজারে এক সওদাগরি অফিসে সামান্য মাইনের চাকরি করেন তিনি। গোবেচারি ভালমানুষ লোক, কারো সাতে পাঁচে নেই। গোলমাল হাঙ্গামা দেখলে সভয়ে এড়িয়ে চলেন! অফিস করে ফিরে সোজা নিজের কুঠুরিতে ঢোকেন। পারতপক্ষে বের হন না।

তবে মাঝে মাঝে অফিস থেকে বাসায় ফিরতে দেরী হয়। বটুকবাবু বই বাঁধাইয়ের কাজ জানেন। অফিসের ফেরত কোনো কোনো দিন চলে যান এক দপ্তরীর কাছে। সেখানে বই বাঁধাই করেন। কোন দিন তাঁর সাহায্য দরকার হলে দপ্তরীই খবর পাঠায়। দুটো বাড়তি পয়সা রোজগার হয়। অবসর সময়ে ঘরে বসে অর্ডার নিয়ে বই-খাতা বাঁধান।

এমনি বটুকবাবুর জীবন। একঘেয়ে। খুবই টেনেটুনে চালান। বেশি পয়সা খরচ করে কোনো ফুর্তি করা বা শখ মেটানোর ক্ষমতা তাঁর নেই।

কিন্তু মানুষটি কল্পনাবিলাসী।

বাইরে যখন সূর্য অস্ত যায়, নিজের খাটে শুয়ে শুয়ে হরেক রকম কল্পনা করেন। যা করতে সাধ হয় কিন্তু সাধ্য নেই। সুখের বিষয় এর জন্য পয়সা লাগে না। কেবল মনের রুদ্ধ দ্বারগুলি খুলে দাও। নাগালের বাইরের জগতের কত অজানা দেশ, অজানা অদেখা মানুষ-জন দৃশ্য কল্পনার রঙে বাস্তব হয়ে ফুটে ওঠে। কল্পনায় কত আমোদ, কত আনন্দের স্বাদ নেয় মন। প্রাণটা হালকা হয়ে যায়। রঙিন হয়ে ওঠে। দিনগত একঘেয়েমি থেকে খানিক মুক্তি পায়।

একটি পুরনো গাইডবুক আছে বটুকবাবুর।

ভারতের দর্শনীয় স্থানগুলির বিবরণ আছে তাতে। সময় পেলে তিনি বইখানি পড়েন। ওই অপূর্ব জায়গাগুলিতে কি ভাবে যাবেন? কি কি দেখবেন? কোথায় কোন ধর্মশালা বা হোটেলে থাকা যায়—ইত্যাদি সম্বন্ধে যা যা লেখা আছে—সব তাঁর মুখস্থ! প্রতিবার পূজোর সময় ভাবেন—এবছর আর হয়ে উঠল না। সামনের বছর সুবিধে হলে বেরিয়ে পড়ব। অন্তত একটিবার ঘুরে আসব। আবার মনের নিভৃতে এও জানেন, সামনের বছর কেন, কোনো কালেই হয়তো তাঁর বেড়ানোর সাধ মিটবে না! এই কলকাতা সহরেই কাটাতে হবে বছরের পর বছর। বড় জোর দু-চার বছর অন্তর একবার কয়েকদিনের জন্য দেশে যাওয়া। ব্যাস্।

বটুকবাবুর দেশের বাড়িখানা বিশাল। অট্টালিকা বলা চলে। তবে এখন জরাজীর্ণ। বহু

শরিকে ভাগ হয়ে গেছে। মাত্র দুটি পরিবার ছাড়া এখন আর কেউ থাকে না ও বাড়িতে। ঠাকুর্দার আমল অবধি বটুকবাবুদের অবস্থা ভাল ছিল। তারপর পড়ে যায়।

দেশের বাড়িতে একটা ভারি সুন্দর মোমবাতিদান পেয়েছিলেন বটুকবাবু। ঠাকুমার সিন্দুকে ছিল। নকসাকাটা কুচকুচে কালো কাঠের স্ট্যাণ্ড। তার মাথায় বিলিতী কাঁচের ঘেরাটোপ। কলকাতায় ঘরের তাকে সাজিয়ে রেখেছেন জিনিসটি। মোমবাতিও লাগিয়ে রেখেছেন। তবে সে মোম জ্বালেন না কখনো। ইলেকট্রিক আলো না থাকলে বরং লণ্ঠন ব্যবহার করেন।

মোমবাতিদানটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পূর্বপুরুষের কত বিচিত্র বিলাস, ঐশ্বর্যগরিমা কল্পনায় ভাসে। বটুকবাবু শুনেছেন, তাঁর বাবার এক ঠাকুরদা ছিলেন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির। নাকি তিনি ডাকাতিও করতেন লুকিয়ে লুকিয়ে। 'ওই দুর্দান্ত পুরুষটির রক্তধারা কি আমার ধমনীতে বইছে?' ভেবে তিনি রোমাঞ্চিত হন। আবার হাসিও পায়।

বটুকবাবু একবার একটা চমৎকার সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ফাউনটেন-পেন কিনেছিলেন! একেবারে জলের দরে। পেনটা হাতে নিয়ে ভাবতে বসতেন—কে ব্যবহার করত এই কলম? হয়তো কোনো সাহিত্যিক। কি লিখেছেন এটি দিয়ে? কেমন তিনি দেখতে ছিলেন? বরাত মন্দ! পেনটা কয়েক দিন বাদেই পিক্‌পকেট হয়ে যায়।

বাঁধাইয়ের জন্যে যে সব বই আসে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার বা ঐতিহাসিক কাহিনী থাকলে বটুকবাবু তা পড়ে ফেলেন। কল্পনার খোরাক জোটে।

বটুকবাবু বাইরের ধুতি, সার্ট গেঞ্জি ছেড়ে লুঙ্গি পরলেন। হাত মুখ ধুলেন। উনুন ধরিয়ে বারান্দার কোণে ছোট্ট রান্নাঘরে ভাত চাপালেন। তার পর শোওয়ার ঘরেতে এসে পিজবোর্ড, কাগজ, আঠা, ছুঁচ সুতো ইত্যাদি বাঁধাইয়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে মেঝেতে বসলেন। এইবার তিনি নতুন কেনা ছুরিটা হাতে নিয়ে মন দিয়ে দেখতে থাকেন।

নাঃ, ঠকিনি। অতি উত্তম জিনিস। খুব মজবুত ইস্পাতে তৈরী। ছুরির একটা খাপ বানিয়ে নিতে হবে, কিন্তু এ বস্তু যেন বটুকবাবুর হাতে মানায় না।

ছুরিখানা কার ছিল? ছেলেটা অমন ভাবে বলল কেন—কার হাতের চাকু জানেন? কে ছিল এর ভূতপূর্ব মালিক? ছুরি না বলে একে বরং ছোরা বলাই উচিত।

ছোরা! শব্দটি উচ্চারণ করতেই এর ভূতপূর্ব মালিকের চেহারা নিয়ে একটা কল্পনা দানা বাঁধে। সে চেহারা, সে মুখ নিষ্ঠুর। যেখানে যত গুণ্ডা বা খুনী জাতীয় লোক দেখেছেন বটুকবাবু বা শুনেছেন যাদের কথা—যারা অনায়াসে ছোরা-ছুরি চালায়—তাদের মূর্তি একের পরে এক মনে ভেসে ওঠে। আর সব ক'জনকে মিলিয়ে একটা নৃশংস বীভৎস রূপ খাড়া করার চেষ্টা করেন।

এ ছুরিতে কি মানুষের রক্ত লেগেছে কখনো? বোধ হয় লেগেছে। বোধহয় কেন, নিশ্চয়ই লেগেছে। হয়তো বারবার।

মানুষের ভিতরকার আদিম পশুটা যখন লোভে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আক্রমণ করেছে অন্য মানুষকে —এই ছুরি তার হাতিয়ার। হয়তো বটুকবাবুর মতো অনেক নিরীহ লোককে আঘাত করেছে এই ছুরি।

আবার হয়তো গুণ্ডাদের নিজেদের মধ্যে হানাহানির সময় তপ্ত নররক্তের স্পর্শ পেয়েছে এই শানিত ইস্পাত ফলা!

ভাবতে ভাবতে গরম হয়ে উঠল বটুকবাবুর শরীর। ডান হাতের পাঁচ আঙুলে শক্ত করে চেপে ধরলেন ছুরির বাঁটটা। বোধহয় এমনি ভাবেই বাগিয়ে ধরা হতো ছুরিখানা। আর অমনি করে—ঝুঁকে হাত চালালেন বটুকবাবু।

খ্যাচ্!

সামনে একটা প্যাকিং বাক্স ছিল। শিশি বোতল কৌটো কাঠের টুকরো—এমনি টুকিটাকিতে ঠাসা। বটুকবাবুর ছুরি বাক্সের পাতলা কাঠের গায়ে আমূল বিঁধে গেল। ফের হেঁচকা টানে খুলে এল ছুরি।

বাঃ। নিজের তৎপরতায় অবাক হয়ে গেলেন বটুকবাবু। এখনও এত তাড়াতাড়ি হাত চালাতে পারি? ফলাটায় কি ভীষণ ধার! কিন্তু ফুটো হয়ে গেল যে বাক্সে? যাক্‌গে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। তীব্র চোখে তিনি খুঁজতে থাকেন অন্য কোনো নিশানার সন্ধান।

হঠাৎ বটুকবাবুর মনে হল, মুঠোর মধ্যে ছুরিটা যেন নড়েচড়ে উঠল। যেন এটা জীবন্ত বস্তু। বুঝি ওর ঘুম ভেঙেছে। অস্থির হয়ে উঠেছে।

তিনি শিউরে উঠে ছুরিটা ফেলে দিলেন। ঠং আওয়াজ তুলে সেটা নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে মেঝেয়।

বটুকবাবু একটুক্ষণ সন্দিগ্ধ ভাবে তাকিয়ে রইলেন ছুরিখানার দিকে। তারপর হেসে উঠলেন জোরে।

শ্রেফ অতিরিক্ত কল্পনার ফল।

ওই জড় ধাতব বস্তুটিতে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই, থাকতে পারে না। অসম্ভব।

ঝকঝকে ফলাটা কেমন অসহায়। যেন এক হিংস্র শ্বাপদ বন্দী হয়ে আছে।

মৃদু হেসে বিড়বিড় করে ছুরিটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—'ওহে, তোমার জারিজুরি খতম! আগের জীবন ভুলে যাও। এবার থেকে শুধু বোর্ড কাট, কাগজ কাট, আলু কাট বেগুন কাট। ব্যাস, তার বেশি নয়।'

বটুকবাবু সত্যি সত্যি পিজবোর্ড কাটতে শুরু করলেন বইয়ের মলাটের জন্যে। কচকচ করে আলু কাটলেন কয়েকটা। তবে তিনি অনুভব করলেন ছুরিখানা হাতে নিলেই বেশ চনমনে লাগে। দেহে মনে কেমন উত্তেজনা ছড়ায়। অনেকক্ষণ ক্ষিপ্রগতিতে কাজ করলেন। কাজ মানে প্রধানত ছুরি দিয়ে এটা সেটা কাটাকাটি। অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে উঠে গিয়ে রান্নাটা সেরে নিলেন। রাত হয়ে যাচ্ছে। বটুকবাবু কাজ বন্ধ করলেন। তারপর খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লেন।

ছুরিটার কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর ঘুম আসতে সময় নিল।

পরদিন। রাত প্রায় ন'টা। বটুকবাবু বাসায় ফিরছেন।

অফিসের পর গিয়েছিলেন দপ্তরীর দোকানে। কিছু কাজ করেছেন। তাই ফিরতে দেরী হল।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছেন। পাড়াটা ভাল নয়। কাছেই একটা বস্তি। সেখানে কিছু

খারাপ ধরনের লোকের বাস। রাতে প্রায়ই বস্তিতে চেঁচামেচি হল্লার আওয়াজ ওঠে। ওখানকার গুণ্ডাদের জোর জুলুম সইতে হয় পাড়ার ভদ্র বাসিন্দাদের। ছিনতাইও হয় কখনো কখনো।

সরু রাস্তা। জোর এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে। তার ওপর লোডশেডিং চলছে। চারিদিক অন্ধকার। কেবল মেঘে ঢাকা ফালি চাঁদের আবছা আলোয় সামান্য নজর চলে।

রাতে এমনিতেই এ পথে লোক চলাচল কম। আজ একেবারে জনহীন। রাস্তার একপাশে কারখানা। তার লম্বা লম্বা টিনের শেড। অন্যদিকে উঁচু উঁচু বাড়ির খাড়া দেয়ালের সারি।

কারখানায় এখন ছুটি। অন্ধকার বাড়িগুলোয় কারো সাড়াশব্দ নেই। শুধু রেডিও নিঃসৃত এক তীক্ষ্ণ গানের সুর ভেসে আসছে ওপরের কোনো জানলা দিয়ে।

বটুকবাবুর গা ছমছম করতে লাগল। পথটুকু পেরতে পারলে বাঁচি।

বহুদিনের চেনা রাস্তা। তবু সাবধানে পা টিপে টিপে হাঁটতে হচ্ছে। খোয়া ওঠা পথে জল জমেছে জায়গায় জায়গায়। পা পড়লে মচকাবে।

এই রাস্তা সিধে গিয়ে এক আড়াআড়ি রাস্তায় মিশেছে। বটুকবাবু বাঁ ধারে ঘুরবেন। তেমাথা মোড়ে পৌঁছে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। কার চাপা আর্তস্বরে কথা এল কানে। কি ব্যাপার?

মোড়ের ঠিক মুখোমুখি, আড়াআড়ি রাস্তা পেরিয়ে একখণ্ড ফাঁকা জমি। রাস্তা ও জমির সীমানা দিয়ে গেছে একটা নোংরা জলের নালা। বটুকবাবু কারখানার পাঁচিলের গায়ে ঘেঁষে এলেন। একটু আড়ালে থাকা ভাল। তারপর উঁকি মেরে অন্ধকার ফুঁড়ে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি মেললেন।

রাস্তার ওপারে হাত পনেরো দূরে নালার ধারে দুটো ছায়ামূর্তি। চেনা যাচ্ছে না। কান খাড়া করলেন বটুকবাবু।

'দোহাই বাবা, আমি গরীব মানুষ।'

'চ্যাপ্। দাও ব্যাগ। বের কর। এই তো'—

কাতর কণ্ঠে যে কথা বলল তাকে চিনতে পারলেন বটুকবাবু। হারাণ ঘোষ। এই পাড়াতেই থাকেন। বাজারে আলাপ হয়েছিল। ভবানীপুরে এক কাপড়ের দোকানে কাজ করেন।

আর এই কর্কশ কণ্ঠের মালিককেও চিনতে ভুল হল না তাঁর। ওর নাম ছক্কু। মানে লোকে ওই নামেই ডাকে। লোকটা গুণ্ডা—ভয়ংকর স্বভাব। অনেক খুন জখমও নাকি ও করেছে। সবাই ওকে ভয় পায়। মাত্র মাস খানেক আগে এই ছক্কু বটুকবাবুর কাছ থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে নিয়েছিল। হুঁ, জোর করেই! অবশ্য মুখে বলেছিল ধার।

সন্ধ্যে নাগাদ বাসায় ফিরছিলেন বটুকবাবু। বস্তির কাছে অতর্কিতে ছক্কু তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। একখানা চওড়া হাত বাড়িয়ে হুকুমের সুরে বলেছিল—'দেকি দাদু, আপনার মানিব্যাগটা।'

বটুকবাবু বাধ্য হয়ে ব্যাগ বের করে দিয়েছিলেন।

ব্যাগে পাঁচটি টাকাই মাত্র সম্বল ছিল। নোটখানা পকেটে পুরে গম্ভীর মেজাজে বলেছিল

ছক্কু—'ধার নিলুম। শোধ দিয়ে দেব। তবে একটু মনে করিয়ে দেবেন মোসাই। নইলে ভুলে যাই। বড্ড ঝুট-ঝামেলায় ব্যস্ত থাকি কি না।'

ফলে বটুকবাবুকে মাসের শেষ সপ্তাহটা শ্রেফ ডাল ভাত খেয়ে কাটাতে হয়েছিল। তরকারি কেনার সামর্থ হয় নি।

ছক্কুর কাছে টাকা ফেরত চাইতে তাঁর সাহসে কুলোয় নি। চাইলেও দিত না নির্ঘাত। উল্টে ফ্যাসাদে পড়তেন।

'বাঃ, এ যে অনেক টাকা। বহুত আচ্ছা।' ছক্কুর কণ্ঠে বিকট উল্লাস শোনা গেল।

'সব নিও না বাবা। আজ মাইনে পেয়েছি। ঘরে যাব! অনেক ছেলেপুলের সংসার।' অসহায় মিনতি জানালেন হারাণবাবু।

'আঃ ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ধার নিচ্ছি। শোধ দিয়ে দেব। তবে একটু খেয়াল করিয়ে দেবেন।'

'দোহাই বাবা—'

'ফের কাঁদুনি। ঘড়িটা খুলে নিইনি তোর বাপের ভাগ্যি। আর এট্টা কতা বললে দেব নালায় চুবিয়ে! যা ভাগ্।'

একটা ধাক্কা মারার আওয়াজ হল।

একটি ছায়া শরীর হোঁচট খেয়ে পড়ল মাটিতে।

কড়া সুরে ছক্কুর শাসানি শোনা গেল—'খবরদার, থানায় রিপোর্ট করলে জানে মেরে দেব কিন্তু—'

হারাণবাবুর খর্বকায় মূর্তি প্রায় দৌড়ে চলে গেল বটুকবাবুর সামনে দিয়ে। হয়তো আরও নির্যাতনের আশঙ্কায় পালিয়ে গেলেন।

বটুকবাবু রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছেন।

নিরীহ শান্তিপ্রিয় ভদ্রজনের এমন দৃশ্য চোখে দেখাও বিপদ। সাক্ষী হলে গুণ্ডার কোপে পড়ার সম্ভাবনা। মানে মানে সরে পড়াই কর্তব্য। অন্য দিন হলে তাই করতেন বটুকবাবু, নিঃশব্দে পিছিয়ে যেতেন গলির ভিতরে। অনেকখানি ঘুর হলেও অন্য পথে বাসায় ফিরতেন। কিন্তু আজ তিনি নড়তে পারলেন না।

বটুকবাবুর মনে আজ কিন্তু লেশমাত্র ভয় জাগে নি। বরং কি এক প্রচণ্ড উত্তেজনায় মাথায় যেন আগুন ছুটছে। বিস্ফারিত চক্ষু। নিজের অজান্তে কখন তিনি বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়ে ধরেছেন নতুন বাঁটটা। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ছুরিটাও ছিল কাঁধের ঝুলিতে।

হারাণবাবু চলে যাওয়ার পর ছক্কু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়।

ফস্ করে জ্বলে উঠল একটা দেশলাই কাঠি।

ছক্কু সিগারেট ধরাচ্ছে।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পটভূমিতে সেই ক্ষুদ্র আলোকশিখা অতি উজ্জ্বল দেখাল। আগুনের আভায় স্পষ্ট হয়ে উঠল ছক্কুর রুক্ষ কঠিন মুখের খানিকটা। তার কোঁচকানো তামাটে গাল, মোটা গোঁফ, পুরু

ঠোঁটের মাঝে লাগানো সিগারেট। আর দেখা গেল তার লালরঙা গেঞ্জির বুক ও পেটের খানিক অংশ।

সহসা বটুকবাবুর মুঠোর মধ্যে ছুরিখানা মোচড় খেয়ে ছটফট করে উঠল। তাঁর সারা দেহে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল। দুরন্ত রাগ ও ঘৃণায় যেন চৌচির হয়ে গেল হৃৎপিণ্ড।

চকিতে তিনি গুঁড়ি মেরে অল্প নিচু হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছুরিকাবদ্ধ ডানহাত বেরিয়ে এল ঝুলির বাইরে। হাতটা উঁচু হল। পিছনে হেলল। এবং পরমুহূর্তে আকর্ণ টানা ছিলা যেমন আকর্ষণমুক্ত হওয়া মাত্র ছিটকে এগোয় তেমনি লাফ দিল সম্মুখে—

তীরের মতো সাঁ করে উড়ে গেল ছুরিখানা।

হেঁচকি তোলার মতো একবার আওয়াজ হল—এবং জ্বলন্ত দেশলাইকাঠিটা হঠাৎ ছক্কুর হাত ফসকে পড়তে পড়তে গেল নিবে।

ছক্কুর দীর্ঘ ছায়া শরীর কুঁকড়ে গেল। এলোমেলো ভাবে কয়েক পা ফেলে হেঁটে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মিশে গেল পথের আঁধারে।

কিন্তু অস্পষ্ট আওয়াজ। ব্যাস্, তারপর সব নিস্তব্ধ।

থরথর করে কাঁপছেন বটুকবাবু। কি যে ঘটল ঠাহর করতে পারছেন না। সমস্ত তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বুঝি স্বপ্ন, অলীক। আচ্ছন্নের মতো তিনি পা চালালেন।

বটুকবাবু টলতে টলতে ঘরে ঢুকলেন। কোনোরকমে ঘামে ভেজা জামাটা টেনে হিঁচড়ে খুলে ছুঁড়ে দিলেন আলনায়। রাতে ফিরতে দেরী হলে রান্না-বান্নার হাঙ্গামা করেন না। মুড়ি-টুড়ি যাহোক খেয়ে নেন। আজ কিন্তু খেতে রুচি হল না। দারুণ অবসাদ ও ক্লান্তিতে তখুনি মূর্ছিতের মতো লুটিয়ে পড়লেন বিছানায়।

মুখে রদ্দুরের তাত লেগে বটুকবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। খোলা জানালা দিয়ে রোদ আসছে। বেশ বেলা হয়ে গেছে। ধড়মড় করে উঠে বসলেন বিছানায়।

উঃ! মাথাটা যেন পাথরের মতো ভারি। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। ডানকাঁধ টনটন করছে ব্যথায়। আর গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। গলা শুকিয়ে কাঠ। হাতড়ে হাতড়ে খাটের পাশে রাখা কুঁজো থেকে গড়িয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে আবার তিনি শুয়ে পড়লেন। এমনকি গত রাত থেকে ঠায়-জ্বলা ঘরের বাল্‌বটা নেবানোর শক্তিও পেলেন না।

এর পর তিনদিন তিনরাত কোথা দিয়ে যে কেটে গেল বটুকবাবু ভাল করে টের পেলেন না। ইতিমধ্যে প্রতিবেশী শ্যামবাবু কখন তাঁর ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকেছেন—জ্বর দেখে ডাক্তার ডেকে এনেছেন—ওষুধ এনে দিয়েছেন—শ্যামবাবুর স্ত্রী তাঁর সেবা যত্ন করেছেন—কিছুই প্রায় খেয়াল নেই।

চতুর্থ দিনে বটুকবাবুর জ্বর ছাড়ল।

সকাল বেলা তিনি ধীরে ধীরে কলতলায় গেছেন, আর একজন ভাড়াটে বিষ্টুবাবু সেখানে দাঁতন করছিলেন। বটুকবাবুকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—'কি দাদা জ্বরে পড়েছিলেন? এখন কেমন?'

'ভাল। জ্বর ছেড়েছে।'

'হুঁ, বেশ কাহিল দেখাচ্ছে।'

বিষ্টুবাবু কাছে সরে এলেন। সতর্ক চোখে চারপাশ দেখে নিয়ে ফিসফিস করেন, 'মশাই শুনছেন কাণ্ড?'

—'কি?'

'সেই যে গুণ্ডাটা, ছক্কু, খুন হয়ে গেছে। আপনি জ্বরে পড়লেন—সেই রাতে।'

'কে মারল?' বটুকবাবু অবাক ভাবে বললেন।

'কে জানে। ছুরি মেরেছিল। নালার ভিতর পড়েছিল মুখ থুবড়ে। সকালে আবিষ্কার হল। পুলিশ এসে নিয়ে গেল বডি। এক্কেবারে ডেড। পাড়ায় খুব হৈ চৈ। কে মেরেছে ধরা পড়ে নি। ওই আর কি। আর কোনো গুণ্ডার কীর্তি। বেটারা এই ভাবেই মরে। উঃ বাঁচলুম মশাই। আপদ গেছে।'

ছক্কু লোকটা আস্ত শয়তান। আমার পাঁচ টাকা কেড়ে নিয়েছিল ও-মাসে। লোকটাকে কবে জানি দেখলাম? খুব শীগগিরি। বটুকবাবু ভাবতে চেষ্টা করেন।

নাঃ, মনে পড়ছে না। রগের কাছে টিপটিপ করে ওঠে।

যাক্‌গে। যত্ত সব গুণ্ডা বদমাইশ। মরেছে ঠিক হয়েছে। বটুকবাবু ছক্কুর চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন।

দিন চারেক বাদে কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে বাঁধাইয়ের কাজ করতে গিয়ে নতুন কেনা ছুরিটা খুঁজে পেলেন না বটুকবাবু। ঘরে তন্নতন্ন করে খুঁজলেন। নেই। দপ্তরীর কাছে খোঁজ করলেন। সেখানেও নেই।

দপ্তরী বলল, 'হাঁ, সেদিন একখানা নতুন ছুরি এনেছিলেন বটে, কিন্তু এখানে তো ফেলে যান নি।'

ইস্, অমন খাসা ছুরিখানা হারাল বুঝি? দপ্তরীর দোকান থেকে বেরিয়ে আর কোথাও গিয়েছিলাম কি? কোথায় যে ফেললাম?

বটুকবাবু কিছুতেই তা মনে করতে পারলেন না।

বাতিঘরের বিভীষিকা

জায়গাটা দেখে দুজনেরই খুব পছন্দ হয়ে গেল।

সমুদ্রতীরে দাঁড়ালে দেখা যায় উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণে অর্ধবৃত্তাকারে অকূল পাথার। বঙ্গোপসাগরের ঢেউগুলি অশ্রান্তভাবে এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। সাগরের দিকে মুখোমুখি হলে পিছনে কিছুদূরে নাতিউচ্চ পর্বতশ্রেণী, উত্তর দক্ষিণে সাগরের তটরেখাবরাবর প্রাচীরের মতো চলে গেছে। নির্জন সমুদ্র সৈকত। বেলাভূমির সাদা ও ঈষৎ কালচে বালুরাশি পেরিয়ে কোথাও রক্তবর্ণ উঁচুনিচু খোয়াই আর শিলাময় কঠিন জমি। মাঝে মাঝে ঝাউ আর কেয়া বন। সেখানে মানুষের বসতি বলতে মাত্র একটি ছোট্ট জেলে পল্লী।

জায়গাটি ভারতের দক্ষিণ উপকূলে ভিজেগাপত্তম থেকে কিছুটা উত্তর পূর্বে। প্রায় চারশো বছর আগে এখানে অন্ধ্র রাজাদের এক বন্দর ছিল। সমুদ্র উপকূলে, পাহাড়ের গায়ে সেই প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে। অনেক ছোট বড় অট্টালিকা, মন্দির ও প্রাকারের চিহ্ন। ঘন আগাছা ও জঙ্গল গজিয়েছে ইট পাথরের ঢিবি আর ভাঙাচোরা খণ্ড খণ্ড দেয়ালের গায়ে। সব চেয়ে কাছের লোকালয়টি অন্তত মাইল দুই দূরে। তাকে বড় জোর আধা শহর বলা যায়, নাম বিমলী। একটা কাঁচা রাস্তা বিমলী থেকে এঁকে বেঁকে এসে পৌঁছেচে ভাঙা বন্দরের কাছে। শহরের লোক এই সমুদ্রতীরে পা দেয় কদাচিৎ। তবে এখানকার জেলেরা প্রায়ই শহরে মাছ বিক্রি করতে যায়, হাট বাজার করতে যায়। অজয় আর সুনীল বিমলীতে বেড়াতে এসেছে তিন দিন হল।

প্রত্যেকদিন দুই বন্ধু হাজির হয় ভাঙা বন্দরের তীরে। ঘুরে ঘুরে দেখে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলি। পাহাড়ে ওঠে, সমুদ্রে স্নান করে, ঝিনুক কুড়োয়। সাধারণতঃ আসে সকালে, দুপুরে ফেরে। একদিন দুপুরে খেয়েদেয়ে এসে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছে।

শহরের কেউ কেউ বারণ করেছে তাদের—'মশাই যাবেন না ওদিকে, ভাঙা বাড়িগুলো সাপখোপের আড্ডা। ফিরতে রাত হলে পথ হারাবেন। তাছাড়া, জায়গাটা ভাল নয়। 'কেন, কাছেই তো ভাল বীচ আছে।'

জায়গাটা কেন ভাল নয়, মানে ভূত প্রেতের ভয়ের কথা পরিষ্কার করে না বললেও তারা ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে। শুনে দুই বন্ধুর জায়গাটার ওপর টান বেড়েছে বৈ কমে নি।

তাদের কাছে জায়গাটির আর এক আকর্ষণ হল এক প্রাচীন লাইট হাউস। পুরনো বন্দর এলাকার সামনে তীর থেকে মাইল দেড় দূরে সমুদ্রের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে লাইট-হাউসটা। গোল গম্বুজের মতো গড়ন। প্রতিদিন অজয়রা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখত এটাকে। জলের মধ্যে ছোট্ট এক নেড়া পাথুরে দ্বীপ। তার ওপর তৈরি হয়েছে লাইট হাউস। এখন অবশ্য ওই আলোক-স্তম্ভের মাথায় আলোর ইশারা নাবিকদের সংকেত জানায় না, সাবধান করে দেয় না।

বন্দরটি পরিত্যক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ওই আলোকস্তম্ভের কাজও ফুরিয়েছে। কিন্তু তার দৃঢ় পাথুরে দেহ সমুদ্র-তরঙ্গের অবিরাম আঘাত সহ্য করে আজও খাড়া রয়েছে। কেবল ওই পাথুরে দ্বীপ নয়, ওর কাছে নাকি একটা ডুবো পাহাড় আছে, তাই তৈরি হয়েছিল লাইট হাউসটা।

'বাঃ চমৎকার কড়িটা।' অজয় সমুদ্রতীরে বালির ওপর থেকে একটা কড়ি কুড়িয়ে নিল।

'দেখি?' সুনীল সেটা হাতে নিয়ে দেখতে থাকে।

প্রায় ইঞ্চি তিনেক লম্বা। হালকা চকচকে হলুদ গায়ে, কালো আর খয়েরি ফুটফুট। মুগ্ধ হয়ে দেখে।

'কড়িটা একবার দেখতে পারি?' গম্ভীর গলায় ইংরেজীতে কথাগুলো কানে যেতে দু'জনে ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠল। পিছনে দাঁড়িয়ে মিস্টার ভেঙ্কটেশ্বর রাও।

অজয়রা ভদ্রলোককে দেখেছে। কিছুটা পরিচয়ও জেনেছে। প্রৌঢ়, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায় মজবুত শরীর, ধারাল মুখের গড়ন, তীক্ষ্ণ চোখ। মাথায় কাঁচা পাকা চুল। চিবুকে অল্প দাড়ি।

অজয়রা এসে পর্যন্ত প্রত্যেকদিন এই ভদ্রলোককে দেখেছে সমুদ্রের ধারে একা একা ঘুরছেন। কখনও সামুদ্রিক জীবের খোলা তুলে পরীক্ষা করছেন। কখনও বা পাথরের ওপর বসে চুপচাপ তাকিয়ে আছেন সমুদ্রের দিকে আর চুরুট টানছেন। তাঁর পরনে থাকে শার্ট ও ট্রাউজার্স্ এবং রদ্দুরের সময় মাথায় ক্যাপ।

বিমলীর বাসিন্দাদের মধ্যে মাত্র এই একটি লোক প্রায় নিয়মিত প্রাচীন বন্দরের কাছে সমুদ্রতটে আসেন। শহরের অন্য লোকেরা যে সমুদ্র সৈকতে যায় সেখানে তিনি যান না। ভদ্রলোকের চালচলন রহস্যময়।

বিমলীর প্রান্তসীমায় একটি ছোট বাড়িতে মিস্টার রাওয়ের বাস। একা থাকেন। একটি পরিচারক তাঁর কাজকর্ম করে দেয়। পাঁচ বছর হল এসেছেন এখানে। চাকরি কিংবা ব্যবসা কিছুই করেন না। ঘরে থাকেন বা একা বেড়িয়ে সময় কাটান। রাও প্রথম বিমলীতে এসেছিলেন দিন পনেরোর জন্য। জায়গাটা পছন্দ হয়ে যাওয়ায় মাস ছয় পরে এসে বাড়ি কিনে পাকাপাকিভাবে রয়েছেন।

শহরের লোক রাওয়ের ব্যক্তিগত জীবনের খবর সামান্যই জানে। আগে নাকি উনি জাহাজে কাজ করতেন। লোকটি অহংকারী ধরনের। এই শহরের লোকদের সঙ্গে মেশেন না মোটে। তবে ভদ্রলোক বোধ হয় বেশ শিক্ষিত। কারণ বিমলীর যে দু-চার জনের ওঁর ড্রইংরুমে উঁকি দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে তারা দেখেছে, ঘর ভর্তি নানা বিষয়ের বই। শহরের লোক ওঁকে এড়িয়ে চলে। কিন্তু সমুদ্রতীরে জেলেদের সঙ্গে মিস্টার রাওয়ের দিব্যি খাতির আছে। গরীব জেলেদের তিনি টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেন বলে শোনা যায়।

মাঝে মাঝে রাও বিমলী ছেড়ে ডুব মারেন কয়েক দিনের জন্য। রাওয়ের পুরনো পরিচিত কোনও অতিথি এখানে এসেছে কদাচিৎ। শহরের কারও সঙ্গে তাদের আলাপ করিয়ে দিতে রাও আগ্রহ বোধ করেন নি। নানা গুজব আছে রাও সম্বন্ধে। সেগুলি মানুষটির বিষয়ে সন্দেহই জাগায়।

'কি, দেখাবেন ?' দু'জনকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে রাও অধৈর্য হয়ে বললেন।

'হাঁ, এই যে', থতমত খেয়ে অজয় কড়িটা মিস্টার রাওয়ের হাতে তুলে দিল। রাও কড়িটা একবার ঘুরিয়ে দেখে মাথা নাড়লেন, তারপর অজয়ের হাতে সেটি ফিরিয়ে দিলেন।

'কি, কড়িটা ভাল ?' অজয় জিজ্ঞেস করল।

'ভাল তবে রেয়ার নয়। আমি ভেবেছিলাম অন্য এক রকম।'

'এ কড়ির নাম জানেন ?'

'জানি। সাইপ্রেইয়া টাইগ্রিস লিনে। সোজা কথায় ব্যাঘ্র-কড়ি। বাঘছালের মতো গায়ের রঙ কিনা।'

অজয়রা বুঝল, ভদ্রলোক সামুদ্রিক জীব-জন্তু সম্বন্ধে যথেষ্ট জানেন। নইলে টপ করে এর বৈজ্ঞানিক ল্যাটিন নাম বলে দেন কি করে ? এই অদ্ভুত রহস্যময় লোকটিকে তারা কৌতূহলী চোখে দূর থেকে দেখেছে। কাছে পেয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল।

কথাবার্তা ইংরিজীতেই হচ্ছিল।

অজয় বলল, 'আপনি প্রত্যেক দিন এখানে বেড়াতে আসেন দেখেছি।' 'হুঁ।'

'আপনি বিমলীতে থাকেন ?'

রাও এবার শুধু সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে 'হাঁ' জানালেন।

'আপনারা কোত্থেকে ? বাঙালী মনে হচ্ছে ?' এবার পালটা প্রশ্ন করলেন রাও।

'হ্যাঁ, বাঙালী। আমি কলকাতায় থাকি, ও হায়দ্রাবাদে। আমি অজয় দাস, ও সুনীল রায়।'

'এখানে কেন ?'

'এমনি বেড়াতে এসেছি।'

'এখানে তো কোনও টুরিস্ট আসে না। পাণ্ডব বর্জিত জায়গা।'

'সুনীলের এক অন্ধ্রদেশী সহকর্মীর একটা বাড়ি আছে এখানে। তার কথাতেই এসেছি। ওর বাড়িতেই উঠেছি। বাড়িটা প্রায় খালি। কেবল এক বৃদ্ধা থাকে। খাসা আছি,' জানাল অজয়।

'এই সী-বীচে কেন ? শহরের কাছে তো আরও ভাল বীচ রয়েছে।' অজয়দের উপস্থিতি যেন ভদ্রলোকের পছন্দ নয়।

'কেন, আপনি যে আসেন ?'

অজয়ের কথায় একটু থমকে গেলেন রাও। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন—'আমার কথা আলাদা। আমি আসি সামুদ্রিক জীব-জন্তুর খোঁজে। সে দিক দিয়ে বীচটা চমৎকার। কত রকম প্রাণী ভেসে আসে। তাছাড়া লোকের ভিড় আমার সহ্য হয় না।'

'আমাদের কিন্তু দারুণ লাগছে বীচটা। কত ঐতিহাসিক চিহ্ন এখানে।'

'আপনাদের ইতিহাসে আগ্রহ আছে ?'

'আছে। আমি ইতিহাস পড়াই কলেজে, ও অবশ্য ইঞ্জিনিয়ার।' জানাল অজয়।

'বন্দুক এনেছেন কেন ?' সুনীলের কাঁধে ঝোলান শট্-গানটার দিকে দেখালেন রাও।

'ভেবেছিলাম শিকার টিকার যদি মেলে। এই পাখি টাখি।' সুনীল উত্তর দিল।

'এখানকার শান্তি নষ্ট করবেন?' রাও যেন বিরক্ত।

'না না, তাই গুলি ছুঁড়তে ইচ্ছে করে নি। ছুঁড়িও নি একটাও। এমনি সঙ্গে রেখেছি,' বলল সুনীল।

রাও বললেন, 'ওই ধ্বংসস্তূপগুলোয় ঢুকতে গেলে অবশ্য বন্দুকটা কাজে লাগবে। বিষাক্ত সাপ আছে ওখানে আর হিংস্র শেয়াল। শ্মশানের মড়া খেয়ে খেয়ে শেয়ালগুলো মাংসাশী হয়ে উঠেছে। সাবধানে যাবেন।'

'আপনার সামুদ্রিক জীবের কলেকশন্ আছে?' অজয় জিজ্ঞেস করল।

'হুঁ।'

'আমরা যদি একদিন দেখতে যাই?'

মিস্টার রাওয়ের কপালে ক'টি ভাঁজ পড়ল। উত্তর দিলেন না। বোঝা গেল তাদের বাড়িতে আহ্বান করতে রাওয়ের অনিচ্ছা। বেশি মাখামাখি করতে চান না।

অজয় তবু হাল ছাড়ে না, ভাব জমাবার চেষ্টা করে।

'আচ্ছা ওই লাইট হাউসটায় যাওয়া যায়?' অজয় আঙুল দেখায়।

ভেঙ্কট রাও ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন লাইট হাউসটা। শরতের পরিষ্কার সকাল। তেজী রোদে ঝকঝক করছে আলোক-স্তম্ভের কালচে পাথুরে দেহ। পটভূমিকায় দিগন্ত ছোঁয়া ঘন নীল জল। ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে।

'কেন? ওখানে কেন?' জানতে চাইলেন রাও।

'এমনি, দেখতে যেতে চাই। লাইট হাউসের মাথা থেকে সমুদ্র দেখতে নিশ্চয়ই দারুণ লাগবে। ওর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠা যায়? জানেন?'

'হুঁ, যায়।'

'ওই রক্‌টায় পৌঁছান যায় না?'

'যায়, তবে রিস্কি।'

রাওয়ের সাবধানবাণী অজয় গ্রাহ্য করল না। মহা উৎসাহে বলল—'জেলেদের বললে রাজী হবে না নিয়ে যেতে?'

'বলা শক্ত। তবে আমার পরামর্শ যদি চান বলব, শখের অ্যাডভেঞ্চার করতে এতটা ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না। ওখানকার ডুবো পাথরে করাতের মতো ধার, নৌকো বেকায়দা আছড়ে পড়লে ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে।'

'আমরা সাঁতার জানি।' অজয় জোরাল কণ্ঠে জানায়।

'ও সুইমিংপুলের বিদ্যে কোনও কাজে দেবে না।' ভেঙ্কট রাওয়ের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে ওঠে।

'আমরা ভয় পাই না',—গরম হয়ে বলল অজয়।

'অল রাইট। উইশ ইউ গুড লাক।' মিস্টার রাও হঠাৎ ফিরে হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন। বোধ হল মনে মনে বেশ চটেছেন।

অজয় ও সুনীল দু জনেই শক্ত সমর্থ যুবক, ডানপিটে বেপরোয়া। রাওয়ের বিদ্রূপে তাদের জেদ চেপে গেল। যেতেই হবে ওই লাইট-হাউসে। বিপদজনক হলেও পরোয়া নেই। জেলে পল্লীতে গিয়ে তারা লাইট হাউসে পৌঁছনর কি ব্যবস্থা করা যায় তার চেষ্টা করতে লাগল।

কয়েকজন জেলে স্রেফ না করে দিল। বিদেশী লোক জলে ডুবে মরলে তাদের হাতে হাতকড়া পড়বে। জেলেদের কথা ঠিক বোঝা যায় না। হাত মুখ নেড়ে ইশারায় যদ্দুর সম্ভব বোঝাবুঝি চলে। শেষে এক বৃদ্ধ মাতব্বর জেলেকে ধরল অজয়রা। সুনীল অবশ্য কিছু তেলেগু শিখেছিল। সেই কথাবার্তা চালাচ্ছিল। সুবিধে হল বুড়ো জেলে খানিক হিন্দী ও ইংরিজী জানে। সে অনেক দিন কাজ করেছে ভিজেগাপত্তম্ বন্দরে। তাই শিখেছে। বুড়োকে অনেক খোসামোদ করতে সে কয়েকজন জেলেকে রাজী করাল, অবশ্য মোটা বকশিস কবুল করে।

জেলেরা বলল যে আসচে কাল সমুদ্র যদি শান্ত থাকে তো তাদের লাইট-হাউস দেখিয়ে আনবে। সকালে যখন তারা মাছ ধরতে বেরবে তখন তাদের নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে যাবে। নামিয়ে দেবে লাইট-হাউসের তলায়। তারপর তারা পাড়ি দেবে খোলা সমুদ্রে। আবার সাত-আট ঘণ্টা পরে মাছ ধরে তীরে ফেরার সময় তুলে আনবে।

জেলেদের কাছে একটা খবর জেনে খুব অবাক হল অজয়রা। ভেঙ্কট রাও নাকি প্রায়ই যান ওই লাইট হাউসে। এমন কি কখনও কখনও রাতেও থাকেন। কথাটা বেমালুম চেপে গেলেন কেন ভদ্রলোক? আশ্চর্য!

'বেশ, আমরাও রাত কাটাব ওখানে', প্রস্তাব দিল সুনীলরা, 'তারপর ভেঙ্কট রাওকে শুনিয়ে দেব শখের অ্যাডভেঞ্চারের দৌড় কত।'

বুড়ো জেলে শুনেই আঁতকে উঠল। 'উরি ব্বাপ্। কাল আবার পূর্ণিমা।'

'কেন পূর্ণিমায় আপত্তির কি?'

বুড়ো চোখ বড় বড় করে বলল, 'এই সব পূর্ণিমা রাতে লাইট-হাউসটা দানোয় পায়। বাতাসে চিৎকার ভেসে আসে ওদিক থেকে। অনেক জাহাজ নৌকো ডুবেছে ওখানে, অনেক লোক মরেছে, তাদের প্রেতাত্মারা পূর্ণিমা রাতে জড়ো হয়ে কাঁদে, আর্তনাদ করে।'

'কিন্তু মিস্টার রাও যে যায়?'

বুড়ো হাত নেড়ে মুখ ভঙ্গি করল। বোঝাল, পাগল লোকটা যা করে অন্য পাঁচজন সুস্থ মানুষের কি তা সাজে? ও ঠিক মরবে একদিন।

পূর্ণিমা রাতে ভূতুড়ে আওয়াজ অজয়দের মনে বেশ দাগ কাটল। খটকা লাগল, কি করতে রাও যায় ওখানে? লোকটা কি সত্যি ক্ষেপাটে না আর কিছু? যাহোক লাইট-হাউসে রাত কাটানোর প্ল্যানটা আপাতত বাদ দিল তারা। থাকা যাবে কিনা বুঝে নিয়ে পরে বরং একবার রাত কাটিয়ে আসবে ওখানে।

* * * *

পরদিন ভোরে জেলে পল্লীতে হাজির হল অজয় ও সুনীল। দুটো নৌকো সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছিল। তার একটায় উঠল অজয়রা।

শান্ত সমুদ্র। অনুকূল স্রোত। তরতর করে এগিয়ে চলল নৌকো। আকাশ সামান্য মেঘলা। তাতে দিব্যি আরামই লাগছিল। একটা নৌকো এগুল উত্তর-পূর্বে আর অজয়দের নৌকো একটু ডাইনে বাঁক নিয়ে সোজা লাইট-হাউস লক্ষ্য করে চলল।

লাইট-হাউসের কাছে পৌঁছে খুব সাবধানে নৌকো বাইছিল মাঝিরা। ওরা জানে কোথায় কি বিপদ। লাইট-হাউসের দক্ষিণে অল্প দূরে একটা ডুবো পাহাড়ের তীক্ষ্ণ চূড়ো দেখা গেল। তখনও প্রায় ফুট দুই জলের ওপর জেগে রয়েছে। পুরো জোয়ারের সময় ডুবে যায়।

যে শিলাস্তূপের ওপর লাইট হাউসটা তৈরি হয়েছে মাঝিরা তার গায়ে নৌকো ভেড়াল। একটা খাঁজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল নৌকো। খাঁজের গায়ে পাথর সিঁড়ির মতো ধাপ করে কাটা। তাই নামতে অসুবিধা হল না। অজয়দের নামিয়ে দিয়ে নৌকো আবার রওনা হল তার সঙ্গী তরীটি লক্ষ্য করে। দ্বিতীয় নৌকোটিকে তখন দূর সাগরের বুকে বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে।

ধীরে ধীরে দ্বীপের ওপরে উঠল অজয় ও সুনীল। তীর থেকে এটা যত ছোট দেখায় আসলে তার চেয়ে ঢের বড়। জলের ওপর বেশ খানিকটা মাথা তুলে রয়েছে। পাথর কেটে সমান করা হয়েছে ওপরে খানিকটা জায়গা। ঘাড় বাঁকিয়ে মুখ উঁচু করে দেখল তারা। অন্তত ষাট-সত্তর ফুট খাড়াই হবে স্তম্ভ। তলা থেকে ওপর দিকে একটু সরু হয়ে গেছে। স্তম্ভের নিচের অংশে পাথুরে দেয়ালে একটা বড় ফাটল দেখা গেল। কালের নির্মম আঘাত সহ্য করে আর এটা কতদিন টিঁকে থাকবে কে জানে?

দ্বীপের পাথর কালচে ও মেটে রঙের। তাতে শ্যাওলার সবুজ ছোপ ছোপ। শিলা খণ্ডের ফাঁকে জমা মাটিতে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মেছে। হঠাৎ মানুষের আগমনে কয়েকটা বড় বড় সামুদ্রিক পাখি ডানা মেলে আকাশে উড়ল। চক্রাকারে পাক খেতে লাগল মাথার ওপর। তীক্ষ্ণ ভীত স্বরে ডেকে ডেকে জানাতে লাগল তাদের বিরক্তি। অজস্র সামুদ্রিক জীবের খোলা ও হাড় ছড়ানো রয়েছে দ্বীপে। দ্বীপের কিনারে লেগে ঢেউগুলি ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছে। শিলাস্তূপের গা বেয়ে অনেকখানি উঠে আসছে জল। আবার পিছিয়ে যাচ্ছে গড়িয়ে।

পিছল পাথরের গায়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে দু জনে লাইট হাউসের নিচে পৌঁছল। ওপরে উঠার সিঁড়ির মুখে দরজায় এখন কপাট নেই, হাঁ করে আছে। পাক খেয়ে সরু সিঁড়ি উঠে গেছে। ওরা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

ভিতরটা স্যাঁতস্যাতে আঁসটে গন্ধ কেমন। তবে সিঁড়িগুলো প্রায় অক্ষত আছে। দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট চৌকো ঘুলঘুলি দিয়ে ক্ষীণ সূর্যের আলো ঢুকছিল ভিতরে, তাই উঠতে অসুবিধা হচ্ছিল না বিশেষ। তবে তারা টর্চও জ্বালছিল দরকার মতো।

একটা কামরায় এসে হাজির হল তারা। এই ঘরে বোধ হয় থাকত লাইট-হাউসের রক্ষক।

গোল ঘরটা মোটামুটি পরিষ্কার, যেন কেউ ঝাঁট দিয়েছে। এক কোণে কিছু জঞ্জাল জড়ো করা। ঘরের তিন দিকে তিনটে ছোট জানলা। এক সময় জানলায় পাল্লা ছিল নিশ্চয় কিন্তু এখন স্রেফ ফুটো। 'মিস্টার রাও এ ঘরে আসেন—এই যে প্রমাণ।' অজয় মেঝেতে একটা চুরুটের টুকরো দেখাল।

এ ঘরের কোণ দিয়ে আবার সিঁড়ি উঠে গেছে। ওপরে উঠল অজয়রা। মনে হয় এই বুঝি আলোক স্তম্ভের ছাদ। আসলে এটাই ছিল বাতিঘর।

ঘরে দেয়াল বলতে কিছু নেই। গোল মেঝের ধারে ধারে সমান দূরত্বে কতগুলো পাথরের থাম খাড়া হয়ে আছে—মোট আটটা থাম। থামের মাথায় আর ছাদ নেই এখন। এক সময় বাতি ঘরের চারপাশ ছিল কাচে ঘেরা। থামের গায়ে কাচ আটকানোর ফ্রেম বসাবার গর্ত দেখা গেল। তবে কাচ বা ফ্রেমের চিহ্ন নেই আজ। এই ঘরেই জ্বালা হতো অগ্নিকুণ্ড কিংবা মোম বা তেলের উজ্জ্বল বাতি। সেই বাতি বন্দরে আসা যাওয়ার সময় তরীকে হুঁশিয়ার করে দিত।

চারধারে খোলা থাকার দরুণ ঘরটার ভিতর দিয়ে যেন ঝড় বইছে। শক্ত করে থাম আঁকড়ে তবে দাঁড়াতে হয়। এই টংয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখা সত্যি এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। শুধু পশ্চিমে তটরেখা, বাকি তিন পাশে অসীম বারিধি। দিকচক্রবাল ঢালু হয়ে উঠে গেছে। আর সেই ঢাল বেয়ে যেন নেমে আসছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। যত কাছে আসে ঢেউগুলি স্পষ্ট হয়, উঁচু হয়, আর যেন তাদের গতি বাড়ে। জল ও বাতাসের কি অবিরাম গর্জন! ফেনিল তরঙ্গগুলি নাচতে নাচতে ছুটে এসে লাফিয়ে পড়ছে পায়ের নিচে শিলাস্তূপে। ক্ষুদ্র ভূ-খণ্ডটির ওপর বিপুল জলরাশির কি আক্রোশ! বাতাসের তোড়ে খুব চেঁচিয়ে না বললে কথা শোনা যাচ্ছিল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে দেখল দু-জনে সাগরের এই চঞ্চল রূপ। মিস্টার রাওকে ধন্যবাদ। তার ঠাট্টার খোঁচা খেয়েই জেদ করে চলে এল, নইলে আসা হতো কিনা সন্দেহ।

সমুদ্রের বাতাসের গুণে এবং পরিশ্রমে বেশ খিদে পেয়ে গিছল। অজয়রা নেমে এল নিচের ঘরে। হ্যাভারস্যাক খুলল। স্যাণ্ডউইচ ও কফি খেল। তারপর মেঝেয় সতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে অজয়রা আবার চড়ল বাতিঘরে। আরে একি, আকাশের একি পরিবর্তন!

আকাশে কালো করে মেঘ জমেছে। দিনের আলো ফ্যাকাশে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড় বৃষ্টি আসবে না কি?

ঝড় বৃষ্টি এল ঠিকই, তবে এমন কিছু নয়। অন্তত তীরে থাকলে তাই বলত অজয়রা। কিন্তু লাইট-হাউসের প্রহরীর ঘরে আশ্রয় নিয়ে তাদের মনে হল যেন প্রলয় শুরু হয়েছে। বাইরে জল ও বাতাসের কি শোঁ শোঁ গর্জন। থেকে থেকে বাজের কি হুংকার, আর চোখ ধাঁধানো বিদ্যুতের চমক। ছাদের সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে এবং জানলার ফুটো দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট ঢুকে তাদের বেশ ভিজিয়ে দিল।

ঘণ্টা দেড়েক পরে বৃষ্টি ধরে গেল। কিন্তু বাতাসের বেগ কমল না। একবার বাতিঘরে উঠতেই মনে হল বাতাস বুঝি ধাক্কা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ভয়ে নেমে এল তারা। সমুদ্রও উদ্দাম। এমন স্রোতে এই বিপদ-জনক এলাকায় কি আসবে তাদের নৌকো? অবশ্য এখনও সময় আছে।

বেলা চারটে বাজল। অজয়দের নৌকো কিন্তু এল না। যদিও ততক্ষণে সমুদ্র ফের শান্ত হয়ে এসেছে। ঝড় বৃষ্টির দাপটে ওই ডিঙ্গি নৌকোকে যে কতদূরে ঠেলে নিয়ে গেছে কে জানে?

'আজ বোধ হয় এখানেই রাত কাটাতে হবে', বলল অজয়, ভাগ্যিস বেশি করে খাবার এনেছি সঙ্গে। কাল নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। ভাড়া পায় নি যখন আসবে ঠিকই।'

প্রহরীকক্ষের জানলা দিয়ে সুনীল তীরের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলে উঠল—'দেখ, একটা নৌকো আসছে এদিকে। আরে মিস্টার রাও যে!'

নৌকোখানা তখন প্রায় লাইটহাউসের পায়ের কাছে পৌঁছেচে। তিনজন মাঝি নৌকো বাইছে। একজন ধরেছে হাল। রাও বসে আছেন পাটাতনে।

'ভালই হল। দেখা যাক রাও এখানে কি করেন। সম্ভবত উনি আজ রাত কাটাবেন এখানে।' বলল অজয়।

রাওয়ের নৌকো দ্বীপে ভিড়ল।

একটু পরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সিঁড়ি বেয়ে একজন উঠে আসছে। রাও যখন দরজায় এসে দাঁড়ালেন দু-বন্ধু তখন নির্বিকার ভাবে কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

কয়েক মুহূর্ত থমকে থেকে রাও কথা বললেন—'আপনারা এসেছেন আমি শুনেছি! আমার নৌকো এখুনি ফিরবে তাতে ফিরে যান। আপনাদের নৌকোর আজ আর আসার চান্স নেই। আশা করি যথেষ্ট অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে?' রাওয়ের ঠোঁটে ব্যঙ্গের আভাস।

'না।' মাথা নাড়ল অজয়।

'মানে?'

'মানে, আমরা আজ রাতটাও কাটাব এখানে। অ্যাডভেঞ্চারটা পুরোপুরি করতে চাই।'

'আপনারা যাবেন না?'

'আজ্ঞে না সার।' দৃঢ়কণ্ঠে জানাল অজয়। সুনীলও মাথা নেড়ে সায় দিল।

রাগে রাওয়ের চোখ দুটো যেন ঝলসে উঠল। গভীর একটা দম নিয়ে কোনও রকমে সামলালেন নিজেকে। কঠিন চাপা কণ্ঠে বললেন—'অলরাইট্।' এরপর তিনি বাতিঘরে উঠে গেলেন গটগট করে।

উঁকি মেরে দেখল অজয়রা, রাও হাত নেড়ে ইশারা করলেন তাঁর নৌকোর মাঝিদের। একটু পরে দেখা গেল নৌকো ফিরে চলেছে তীরের দিকে।

রাও বাতিঘর থেকে নামলেন না।

নিচের ঘরে অজয় ও সুনীলের মহা অস্বস্তি। মতলব কি লোকটার? স্মাগলার নয়তো? ওরা শুনেছে বঙ্গোপসাগরের কূলে চোরাচালানকারীদের লঞ্চ আসে। নির্জন তটে দলের লোকের কাছে নামিয়ে দেয় বহুমূল্য চোরাইমাল। রাও কি সেই দলের লোক? লাইটহাইস থেকে সংকেত জানান তাদের? সম্ভাবনাটা মনে এলেও মানতে ইচ্ছে হয় না। হাজার হোক লোকটা শিক্ষিত। খামখেয়ালী হলেও ভদ্রলোক বলে মনে হয়। যাহোক সতর্ক থাকতে হবে।

পশ্চিমে পর্বতমালার আড়ালে সূর্য অস্ত যেতে লাগল। সাগরের বুকে কি অপূর্ব রক্তিমছটা!

'ওপরে আসতে পারেন।' হঠাৎ রাওয়ের ডাক শুনে অজয়রা অবাক হল।

যাহোক ভূতের মতো আধো অন্ধকারে বসে থাকার চেয়ে ওপরে যাই। লোকটির কাছাকাছি থাকলে বরং বিপদটা আন্দাজ করতে সুবিধে হবে। দু-জনে গুটিগুটি ওপরে গেল। বাতিঘরের মেঝেতে বসে আছেন রাও। সুনীলকে দেখেই প্রশ্ন করলেন 'বন্দুক এনেছেন নাকি?"

'না।' মাথা নাড়ল সুনীল।

'ভালই করেছেন। আনাড়ি লোক ঘাবড়ে গিয়ে গুলি চালালে উপকারের চেয়ে অপকারই হয় বেশি।'

সুনীলের অবশ্য তখন খুব আপসোস হচ্ছে, কেন বন্দুকটা আজ আনলাম না?

'ইয়ংমেন, সাহসের খুব বড়াই করছিলে। বেশ, দেখা যাক তোমাদের নার্ভ কেমন শক্ত। আশা করি তোমাদের অ্যাডভেঞ্চারের সাধ আজ মিটবে।' চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন রাও।

'কেন কি হবে?' অজয়ের উদ্বেগ আর চাপা থাকে না। 'দেখতেই পাবে। অবশ্য যদি তোমাদের লাক্ থাকে।'

রাও আর কথাবার্তা না বলে সমুদ্রের দিকে চোখ ফেরালেন। অগত্যা অজয় ও সুনীল বসে পড়ে সমুদ্র দেখতে থাকে।

পূর্ণিমার রাত। মস্ত গোল চাঁদ উঠছে সাগরের কোল থেকে। ঈষৎ লালচে চাঁদ ক্রমে রূপালী রঙ নিল। ওপরে ফুটফুটে আকাশ। নিচে বিপুল জলরাশি জোয়ারের টানে ফুলছে, ফাঁপছে, ছুটছে। যেন তরল রূপোর স্রোত বইছে। অপরূপ অপার্থিব সেই দৃশ্য। অজানা দুর্ভাবনার ভার না থাকলে তারা এই সৌন্দর্যকে আরও অনেক উপভোগ করতে পারত।

ছমছম করছে মন। কি হবে? তবে কি কোনও ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটতে চলেছে? জেলেদের কথাই কি তবে ঠিক? রাও ঠায় তাকিয়ে আছেন বাইরে। হাতে জ্বলন্ত চুরুট। মাঝে মাঝে অস্থিরভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছেন সমুদ্রের একধার থেকে আর এক ধার কিন্তু তীরের দিকে একবারও চাইছেন না।

রাত প্রায় বারোটা। জল ও বাতাসের তর্জন সমানে চলেছে। হঠাৎ রাও একটু ঝুঁকে পড়লেন। নিবিষ্ট চোখে দেখছেন কিছু। অজয়রাও দেখতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছু ঠাওর করতে পারে না।

রাও চকিতে ফিরলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—'সে আসছে। থামের আড়ালে যতটা পারেন লুকিয়ে বসুন। ওই দিকে লক্ষ্য করুন।' তিনি পুব-দক্ষিণে সাগরের বুকে আঙুল দেখালেন।

'কি আসছে?' জিজ্ঞেস করল অজয়। রাও জবাব দিলেন না।

অজয়রা রাওয়ের নির্দেশ মতো যথাসম্ভব গা ঢাকা দিয়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল। তাদের বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পিটছে। জানা বিপদ থেকে অজানা বিপদের সম্ভাবনাই বেশি ভয়ের ও রহস্যময়।

খানিকক্ষণ কিছুই তাদের নজরে এল না। তারপর আবছা দেখতে পেল। পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোক এবং জলে ফসফরাসের ঝিকিমিকিতে দেখল—সাগরের বুক চিরে কিছু একটা এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।—খুব লম্বা। গাঢ় রঙ। গোল পিঠ। তীব্র বেগে জল কেটে এগোচ্ছে।

কি ওটা? কোনও জীবন্ত প্রাণী না টর্পেডো জাতীয় কোনও সামুদ্রিক যান? এখনও ওটা মনে হয় মাইল খানিক দূরে।

হু হু করে এগোতে এগোতে লাইট হাউস থেকে শ' খানেক হাত দূরে এসে সেটা হঠাৎ থেমে গেল। তারপর জল থেকে উঁচু হতে লাগল এক বিপুল লম্বা দেহ। বারকয়েক বেঁকেচুরে মোচড় খেয়ে খাড়া হয়ে রইল। জল ছেড়ে অন্তত কুড়ি পঁচিশ হাত উঠেছে সে। রুদ্ধশ্বাসে দেখতে লাগল অজয় ও সুনীল।

ওটা যে জীবন্ত প্রাণী সন্দেহ নেই। কারণ ওর মস্ত চেপ্টা মাথা দেখতে পাচ্ছে তারা। প্রকাণ্ড পিপের মতো গোল মোটা তার দেহ। অদ্ভুত অলৌকিক ওই জীবটা যেন সোজা তাকিয়ে আছে এই লাইট-হাউসের দিকে।

'কি ওটা?' সুনীল কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল রাওকে।

'কি মনে হচ্ছে?' রাও উলটে প্রশ্ন করলেন।

'বোধ হয় কোনও সামুদ্রিক মহাসর্প', বলল অজয়।

'না'—ধমকে উঠলেন রাও। 'ওর মাথাটা দেখেছেন? ওর দেহের নিচু অংশটা লক্ষ্য করুন।'

প্রাণীটি আরও খানিক ঠেলে উঠল জল থেকে।

সত্যি ও মাথা সাপের হতে পারে না বরং কুমীরের বলা চলে। আর ওর সাপের মতো দেহের তলার দিকটা হঠাৎ চওড়া হয়ে গেছে যেন একটা প্রকাণ্ড উলটনো নৌকো ভাসছে জলে। মাঝে মাঝে সে দুলছে, হাঁ করছে। তীক্ষ্ণ ছুরির মতো দাঁতের সারি ঝকঝক করে উঠছে। মাথার নিচে শরীরের লম্বা অংশটা আসলে ওর বিষম লম্বা গলা।

'তবে কি ওটা?' স্তম্ভিত অজয় জানতে চাইলে।

'আধুনিক কালের কোনও প্রাণী নয়। মনে হয় ডাইনোসর যুগের কোনও সামুদ্রিক সরীসৃপ', জবাব দিলেন রাও।

'ডাইনোসর!' অজয় অবাক হয়ে বলে। 'সে তো কোটি কোটি বছর আগেকার ব্যাপার। সে সময়ের প্রাণীরা তো এখন লুপ্ত।'

'হুঁ ঠিক,' বললেন রাও, 'তাদের এখনও থাকার কথা নয়। তবু দু-এক রকম আদিম প্রাণী আশ্চর্যভাবে আজও টিকে আছে। যেমন, সীলাকান্থ মাছ বা স্কটল্যাণ্ডের লক্-নেস-মনস্টার।'

সহসা প্রাণীটা ডেকে উঠল। ট্রেনের হুইস্‌লের মতো তীক্ষ্ণ জোরাল সেই ডাক। একবার দু-বার তিনবার সে চিৎকার করে উঠল। সাগর আর হাওয়ার অট্টরোল ছাপিয়ে উঠল তার কণ্ঠ।

'নিঃসঙ্গ প্রাণীটা ডাকছে ওর সাথীকে।' রাওয়ের কথা শোনা গেল।

সত্যি ওই প্রচণ্ড চিৎকারে যেন ক্রোধ নেই বরং এ যেন কাতর আর্ত আহ্বান। কয়েকবার চিৎকার দিয়ে প্রাণীটা চুপ করে লাইট-হাউসের দিকে ফিরে স্থির হয়ে রইল।

'আপনি ওটাকে আগে দেখেছেন?' প্রশ্ন করল অজয়।

'দেখেছি', বললেন রাও, 'সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে এখানে আসে পূর্ণিমা রাতে। গত তিন বছর ধরে দেখছি।'

'শুধু একটাই আসে?'

'হ্যাঁ। হয়তো এই শেষ বংশধর। ওর জাতের আর কেউ আজ বেঁচে নেই।'

'এর কথা আপনি জানলেন কি করে?' সুনীল জিজ্ঞেস করল।

রাও বললেন, 'আপনাদের মতোই পূর্ণিমা রাতে জেলেদের মুখে প্রেতাত্মার কান্নার গল্প শুনে কৌতূহলী হয়ে এখানে আসি রাতকাটাতে, তখন দেখতে পাই।

প্রাণীটা লাইট হাউসকে ঘিরে সাঁতরাতে লাগল। খানিক দক্ষিণে গেল। থামল। গলাটা কখনও উঁচু করে তুলছে, কখনও নামাচ্ছে। আবার সে উত্তরে সরে গেল। লাইট-হাউস থেকে প্রায় সমান দূরত্ব রেখে ঘুরছে। মাথা তুলে দুলছে, গলা লম্বা করে দিচ্ছে সামনে। তার মুখ সব সময়ই লাইট হাউসের দিকে ফেরানো।

সে আরও দুবার ডেকে উঠল। তারপর ফের খাড়া হয়ে স্থির হয়ে রইল।

'আরে ওটা এত কাছে আসছে কেন। কি ব্যাপার! এত কাছে তো আসে না কখনও!' রাও বিচলিত স্বরে বলে উঠলেন।

অতিকায় রাজহাঁসের মতো গলা তুলে প্রাণীটা সরসর করে এগিয়ে আসতে লাগল কাছে। একেবারে লাইট হাউসের সামনে এসে থামল। তার শরীরটা স্পষ্ট দেখা গেল। গাঢ় সবুজ চকচকে দেহে চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে। বিশাল চওড়া লেজটাকে সে ঝাপটাতে লাগল। তোলপাড় উঠল জলে। একবার সে ডেকে উঠল ভীষণ জোরে। কানে তালা ধরে গেল যেন। আবার সে নড়ে উঠল—এগোতে লাগল। তারপর মাথা নামাল। অজয়দের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

রাও বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগলেন। একটু পরে চমকে উঠে বললেন—'একি! এ যে দ্বীপে উঠে আসছে!" রাও চট করে ধার থেকে মাথা টেনে নিলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই এক ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল।

লাইট-হাউসের ওপর হঠাৎ আছড়ে পড়ল এক অতি গুরু দেহ ভার। থরথর কেঁপে উঠল স্তম্ভটা। সঙ্গে সঙ্গে বাতিঘরের ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে এল এক প্রকাণ্ড মাথা। অজয় নার্ভাস হয়ে টর্চের আলো ফেলল তার ওপর। এবং ফেলেই নিবিয়ে দিল সভয়ে। সেই চকিত আলোক রশ্মির ঝলকে তিনজনে প্রত্যক্ষ করল এক ভয়ানক দৃশ্য—এক বীভৎস দানব মুণ্ড। অগ্নিগোলকের মতো তার দুই হিংস্র চক্ষু। ক্ষুধিত দাঁতের সারি। একবার দেখা দিয়েই সে সরে গেল, নামিয়ে নিল মাথা।

'আসুন। কুইক।' রাও লাফিয়ে উঠে উদভ্রান্তের মত দৌড়ে গিয়ে নামতে লাগলেন নিচের ঘরে। অজয় আর সুনীলও অনুসরণ করল তাঁকে।

এরপর কিছুক্ষণের অভিজ্ঞতা অজয়দের জীবনে যেন এক দুঃস্বপ্ন। সেই বিরাট সরীসৃপ-দেহ বারবার আছড়ে পড়তে লাগল লাইট-হাউসের গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার কি ক্রুদ্ধ ফোঁস-ফোঁসানি। অজয়দের ভয় হতে লাগল, এই সুদৃঢ় পাষাণ স্তম্ভও বুঝি ওর ধাক্কা সইতে পারবে না। মাঝে মাঝে

জানলার ফুটো দিয়ে নজরে আসছিল ওর বিরাট দেহের অংশ—কখনও তার ঘাড়, কখনও বা মাথার কিছুটা। ভাগ্যি ভাল জন্তুটা তাদের দেখতে পায় নি কারণ তার লক্ষ্য ছিল ওপরের বাতিঘর।

ছাতে অর্থাৎ বাতিঘরের মেঝেয় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল কি সব জিনিস। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন রাও—'ও আজ ক্ষেপে গেছে। লাইট হাউসটাকে ও ভাবত ওর জাতের কেউ। বারবার এসে ডেকেছে তাই। কিন্তু জড়বস্তু সাড়া দেয় নি, ওর সাথী হয়নি। তাই আজ ওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে, মারমূর্তি ধরেছে। এই অবাধ্য জীবটাকে শাস্তি দিতে চায়। জোর করে সঙ্গে নিয়ে যাবে ভাবছে হয়তো।'

মিনিট কুড়ি পরে এই তাণ্ডব হঠাৎ থেমে গেল। একবার জন্তুটার আকাশ ফাটা চিৎকার শোনা গেল। আর তার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন শুধু উত্তাল সাগরের মাতামাতি কানে আসে। লাইট হাউসের প্রহরীকক্ষে তিনটি মানুষে তখন প্রাণভয়ে ইষ্টনাম জপছে।

আরও বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে তিনজন উঠে এল বাতিঘরে। দেখল, প্রাগৈতিহাসিক জীবটা অদৃশ্য হয়েছে, বাতিঘর তছনছ। মাত্র দুটি থাম আস্ত আছে। বাকিগুলো কোনওটা আধভাঙা কোনওটা গোটাই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বড় বড় পাথরের খণ্ড ছড়িয়ে আছে মেঝেতে।

ভরা জ্যোৎস্নায় উদ্দাম দিকহারা সাগরের বুকে চেয়ে বিষণ্ণ স্বরে বললেন রাও, 'বোধহয় ও আর এখানে আসবে না। হয়তো ও বুঝেছে এ চেষ্টা নিষ্ফল। এ বস্তু তার সঙ্গী হতে পারবে না।'

কথাটা সত্যি হয়েছিল। কলকাতায় ফিরে পরপর তিন বছর রাওকে চিঠি লিখে জেনেছিল অজয়—শরতের পূর্ণিমা রাতে রাওয়ের প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপটি আর কখনও আসে নি লাইট হাউসের কাছে। বুঝি ওই নিঃসঙ্গ প্রাণী আজও সাত সমুদ্র চষে কেবলই খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার কোনও সাথীকে!

ছিরুকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল আট-দশটি ছোট ছোট ছেলে। বাচ্চা ছেলেগুলোর চোখ গোল গোল, কান খাড়া। ছিরু মুখে হাত ঢাকা দিয়ে ডাক শুরু করল—'কা কা কা কাঃ'—কাকের ডাক। একেবারে অবিকল।

অমনি মাথার ওপর ঘন পাতা-ছাওয়া বটের ডালের কাকের দল সচকিত হয়ে ডাকতে ডাকতে আকাশে উড়ল। ছেলেরা হাততালি দিয়ে উঠল আনন্দে।—'হাঁ ছিরুকাকা, হয়েছে হয়েছে, ঠিক।'

'ছিরুকাকা আর একটা—আর একটা।'

'নারে আজ থাক,' বলল ছিরু।

'একবার কোকিল ডাকো।'

'না না হাঁসের ডাক। হুইযে আকাশে যেতে যেতে ডাকে।'—ছেলেরা আবদার জানায়।

'বেশ আর নয় কিন্তু।'

ছিরু একটু দম নেয়। একবার খাঁকরি দিয়ে সাফ করে নেয় গলা। তারপর আবার মুখে হাত চাপা দিয়ে ডাক শুরু করে। আকাশ পথে উড়ে যেতে যেতে হাঁসেরা যেমন করে কথা বলে নিজেদের ভিতর—'ওঁক ওঁক্, কক্ কক্'—তাদের নানান সুরে ডাকাডাকি। মিনিটখানেক সেই ডাকের নকল শুনিয়ে ছিরু থামে।

'আহা থামলে কেন? বেশ হচ্ছিল। চালিয়ে যাও।'

ছিরু চমকে ফিরে দেখে কখন তিন-চারটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। তাদের মধ্যে রয়েছে বদন ঘোষ। দাঁত বের করে হাসছে বদন। সেই কথাগুলি বলেছিল। অন্যকজনার মুখেও চাপা হাসি। বদনের গায়ে পাট ভাঙা জামা ধুতি। হাতে একটি থলি। হাট থেকে ফিরছে। সঙ্গের লোকগুলি বদনের চেলা—ওর জমি চষে কেউ। কেউ ওর কাছে হাত পাতে দরকারে।

ছিরু ভারি লজ্জা পেল। হাট থেকে ফেরার পথে সে বসেছিল এই গাছের নিচে। জিরিয়ে নিচ্ছিল খানিক। পাশের গাঁয়ের ছেলেগুলো এসে ধরল ডাক শোনাতে হবে। লোভ সামলাতে পারে

নি ছিরু। একদা নামকরা হরবোলা ছিরু পাল আজ এমনি লুকিয়ে চুরিয়ে বাচ্চাদের ডাক শুনিয়ে শখ মেটায়। দু-একটা সোজা সোজা ডাক। শক্ত ডাক ডাকবার জো নেই যে এখন।

বদনের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলল ছিরু, 'ছেলেগুলো ধরল বড্ড। নইলে—'

'তা ভালই তো হচ্ছে। গতবার মেলায় ডাকলে না কেন?'

ছিরু মনে মনে তেতে উঠল। গতবার নবগঞ্জের মেলায় বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল।—লাঠি খেলা, হা-ডু-ডু ম্যাচ, ঢাকের বাজনা, পটুয়ার গান—এমনি সব। আর ছিল হরবোলার ডাক। অর্থাৎ পশু পাখির ডাকের নকল। বদন ঘোষ সেরা হরবোলা হিসেবে মেডেল পেয়েছিল। ছিরু ডাক দেয় নি। বদন খুব ভাল ভাবে জানে ছিরু কেন নাম দেয় নি। প্রতিযোগিতায় এ সব কাকের ডাক বকের ডাক ডেকে পুরস্কার পাওয়া যায় না। আর ছিরুর পক্ষে এমন ছেলেমানুষী ডাক ডাকাও শোভা পায় না। জেনে শুনেই খোঁচাটা দিল বদন। যেন ছিরুর এর বেশি করার সাধ্যি নেই। অথচ ছিরুর ক্ষমতা কি ওর চেয়ে কেউ বেশি জানে না।

একটু চুপ করে থেকে বলল ছিরু, 'ডাকে নামলে খুব ভাল ডাকই দিতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তুমি তো জানই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নষ্ট করলে গলাটা। সাধনা চাই। সাধনা,' বদন মাতব্বরী ঢঙে বলল।

'ইচ্ছে করে কি আর করেছি। অসুখ হল। বরাত।' ছিরু নত মুখে মাথা নাড়ে।

'ও কিছু নয়। নেশাভাঙ ছাড়। তামাকটা একদম বাদ। গলা ঠিক হয়ে যাবে,' বদন গম্ভীর চালে বলল।

'নেশা ভাঙ আমি করি না। আর তামাক তুমিও তো খাও,' চটে গিয়ে জানাল ছিরু।

'কক্ষনো না। বড় জোর কালে ভদ্রে,' বেবাক মিথ্যে কথা চালিয়ে দিল বদন, 'কি বল?' চেলাদের দিকে চাইল সে। তারাও তৎক্ষণাৎ সায় দিল—

'তা বটে, তা বটে। ঠিক।'

'সংযম চাই হে। সংযম। এই চল চল'—ছিরুকে ফোঁস করতে দেখে বদন বিরক্ত। সঙ্গীরাও বোঝে তার মনের ভাব। উসকে দেয়, —হুঁ হুঁ চলা যাক। সময় নষ্ট। যত ছেলেমানুষী ব্যাপার। তা ঘোষ মশায় একদিন আসর বসান। নতুন ডাক কি কি তুলেছেন? বলেছিলেন শোনাব একদিন।'

'শোনাব শোনাব,' বদনের গলা শোনা যায়, 'ভড়ংটা দেখছো ওনার। যেন কত বড় কেউ-কেটা ছিলেন। আমি তো জানি ওর মুরোদ। হুঁঃ।' শেষ কথাগুলো ছিরুকে শুনিয়েই বলে।

বদনের দল চলে যেতে রাগে গুম মেরে বসে রইল ছিরু। গায়ে পড়ে খোঁচা দিয়ে গেল বদন। অল্প বয়সে একই গুরুর কাছে হরবোলার ডাক শিখেছিল দু'জনা। বদনের বাড়ি পাশের গাঁ পারুলডাঙায়। বন্ধু ছিল তারা। ছিরুর প্রতিভা ছিল বেশি। গুরু অনাথ মালের ভারি পেয়ারের ছাত্র ছিল সে। মনে মনে তাকে তাই হিংসে করত বদন। বদনের ছিল টাকার জোর কিন্তু তা দিয়ে তো আর ডাক তোলা যায় না। তারপর ছিরুর হল গলার দোষ। দুর্ভাগ্য তার। কাশতে কাশতে গলা যেন চিরে যেত। ডাক্তার বারণ করে দিল—হরবোলাগিরি চলবে না। তাহলে গুরুতর অসুখে

পড়বে। জীবন-সংশয় হতে পারে। চেঁচানো নিষেধ। হরবোলার ডাক ছেড়ে দিল ছিরু। বহুদিন একটিও পশুপাখির ডাক সে দেয় নি। আট দশ বছর পরে এখন মাঝে মাঝে দু-একটা সোজা ডাক ছেলে পুলেদের শোনায়। তবে শক্ত ডাক চেষ্টা করে না ভয়ে—পাছে গলায় জোর লাগে।

ছিরু সরে আসতে বদনের হয়েছে পোয়াবারো। নানা জায়গা থেকে তার আমন্ত্রণ আসে হরবোলার ডাক শোনাতে। আর এখন বদন সুযোগ পেলেই একটু খোঁচা দেয় ছিরুকে। তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায়। পুরনো রাগের শোধ তোলে। জানে ছিরু এখন অসহায়। টক্কর দিয়ে হারাতে পারবে না বদনকে। ছিরু মুখ বুজে সয়। তবে আজকের অপমানটা বড় মনে বিঁধেছে। একটা বিহিত করতে হবে। বদনের মুখ চিরকালের মতো সে বন্ধ করে দেবে।

ক'দিন ধরেই ভাবছে ছিরু। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল।—বাঘ। বাঘের ডাক। সার্কাসের কথাতেই মনে এল। নবগঞ্জে এক সার্কাস এসেছে। একটা দুর্দান্ত বাঘ আছে সার্কাসে। খাঁটি রয়েল বেংগল টাইগার। সারাদিন গজরাচ্ছে। প্রায় তিন মাইল দূরে তাদের গাঁ থেকেও মাঝে মাঝে শোনা যায় তার গর্জন। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে বাতাসে ভেসে আসে বন্দী পশুর হুংকার।

একদা বাঘের ডাক তার গলায় খুলত দারুণ। শুনে আঁতকে উঠত লোকে। গুরু অনাথ মাল

বড় যত্নে শিখিয়েছিল। ওই ডাক ঠিক মতো তুলতে পারে নি বদন। বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। গুরু হেসে বলেছিল, 'হচ্ছে না বাপ। কান চাই। দম চাই। যে ডাক শুনলে স্বয়ং বাঘ ভুল করবে, তবেই না সার্থক।' মুখ কালো হয়ে গিছল বদনের।

ওই বাঘের ডাকই ফের তুলবে গলায়। যদি তাতে অসুখে পড়ে তাও সই। আসছে মেলায়

বদনের বেড়ালের ঝগড়া আর শিয়াল কুকুরের ডাক শুনে লোকে যখন বাহবা দেবে তখন সে উঠবে স্টেজে। ব্যাঘ্র গর্জনে পিলে চমকে দেবে লোকের।

ছিরু নিয়মিত নবগঞ্জে যাওয়া-আসা করতে লাগল। প্রতিদিন সে বাঘের খাঁচার পাশে বসে থাকে অনেকক্ষণ। কান তৈরি করে। ভুলে যাওয়া ডাককে ঝালিয়ে নেয় মনে। তারপর নির্জন নদীর তীরে গিয়ে অভ্যেস করে ডাক। খুব সাবধানে। যেন কেউ টের না পায়। তাহলে—বদন নামবে না প্রতিযোগিতায় বেইজ্জতের ভয়ে। বিখ্যাত জগৎ কবিরাজকে গিয়ে ধরল ছিরু—'কবিরাজ মশাই, আমার গলাটা এট্টু আরাম করে দিন। অন্তত কিছু দিনের জন্য।'

মেলা অবধি অপেক্ষা করার মতলবটা পালটে ফেলল ছিরু।

বদন একদিন ডেকে বলল, 'ছিরু, পারুলডাঙায় যাত্রা শুনতে এস আসছে রোববার। পালা—হরিশচন্দ্র।'

'তুমি পার্ট করছ নাকি?' ছিরু জিজ্ঞাসা করেছিল।

'নাঃ। তবে আছি পালায়। শ্মশানের সীনে শৃগালের ডাক দেব। সেই যে মেলায় ডেকেছিলেম সেইটে। ভেবেছিলেম কুটুমবাড়ি যাব এই সময়ে। গাঁয়ের ছেলেরা ছাড়ছে না। বলছে, আমি ডাক না দিলে জমবে না সীনটা। সত্যি, আর কেই বা আছে উদ্ধার করার।'

এরপরই ছিরুর মাথায় গজিয়ে উঠল মতলবটা। উনি ছাড়া এমন এলেম বুঝি কারও নেই। বটে! নিজের মুখে এমন নিজের বড়াই করতে চক্ষুলজ্জাও হয় না! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

যাত্রার দিন ছিরু বিকেলে পারুলডাঙায় গিয়ে খুঁজে পেতে ধরল পারুলডাঙা যাত্রা পার্টির প্রম্‌টারকে। আড়ালে ডেকে বলল, 'হ্যাঁ গো নন্তুজ্যাঠা, কি শুনছি। সার্কাসের বাঘটা নাকি খাঁচা ভেঙে পালিয়েছে?'

নন্তুজ্যাঠা চমকে বলল, 'কে বললে?'

'ক'জন একটু আগে যাচ্ছিল বড় রাস্তায়। বলাবলি কচ্চিল ওই রকম কি একটা। পালিয়েছে—বাঘ—এই রকম কটা কথা এল কানে। লোকগুলো সাইকেলে যাচ্ছিল। ডেকে জিজ্ঞেস করি ভাবতে ভাবতে অনেকটা পেরিয়ে গেল। আর ডাকা হল না।'

নন্তুজ্যাঠা বলল, 'কৈ কেষ্টা তো গিছল সকালে নবগঞ্জে। কিছু বলল না খবর। অবশ্য দুপুরে যদি কিছু হয়?' নন্তুজ্যাঠা নিজের মনে বিড়বিড় করে।

'যা ভয়ংকর জানোয়ার একখান। একবার নাকি পালিয়েছিল মাস দুই আগে। জখম করেছিল একটা লোককে। যাই—' মনে উদ্বেগ নিয়ে চলল নন্তুজ্যাঠা।

'তুমি আবার বল না কাউকে,' ছিরু সাবধান করল নন্তুজ্যাঠাকে, আজ পালা। লোকে অকারণে ভয় পেয়ে শেষে যাত্রা শুনতে আসবে না। বেরতে চাইবে না ঘর থেকে। খবর সত্যি হলে ঠিকই রটে যেত। লোকগুলো রগড় করছিল মনে হয়।'

রাত দশটা নাগাদ নিঃসাড়ে ঘর থেকে বেরুল ছিরু।

গ্রাম তখন নিঝুম। গ্রাম ছাড়িয়ে সে মাঠে নামল। তাদের গাঁ রবিপুর থেকে পারুলডাঙা

মাইল দেড় দূর। মাঝে বিরাট চাষের জমি। ফাল্গুন মাস। ধানের মাঠ ফাঁকা। শীত শীত করছে। আকাশে ফালি চাঁদ। ওই জ্যোৎস্নাটুকু এবং তারার আলোয় ঘন আঁধার কিছু ফিকে। দূরে পারুলডাঙা গ্রামের মাথায় বহু হ্যাজাক বাতির লালচে আভা। অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে। যাত্রার অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর। আলে আলে হেঁটে মাঠ আধা আধি পেরতে কথা স্পষ্ট হয়ে এল। শোনা গেল বিবেকের ভীষণ সুরে গান। ছোট এক ঝোপের পাশে গুছিয়ে বসল ছিরু। আরও খানিক সময় যাক। এখনো মহানুভব রাজা হরিশচন্দ্র রাজ্যপাট হারিয়ে চণ্ডাল বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। শ্মশানের সীন আসার একটু আগে সে এগিয়ে যাবে পারুলডাঙার সীমানায়। তারপর ডাক ছাড়বে বাঘের। অতঃপর দেখা যাক কি ঘটে। মেলা কমিটির প্রেসিডেন্ট হবিবুল্লা সাহেব এসেছেন যাত্রা দেখতে। তার সামনেই বিচার হয়ে যাবে কে বড় হরবোলা। তার গর্জন শোনার পর দর্শকের বদন ঘোষের শিয়ালের ডাক শোনার অবস্থা থাকবে কিনা সন্দেহ। আর যদি কোনও ফল না হয় তার ডাকে, সে সুড়সুড় করে পালিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়বে নিজের বাড়িতে। কেউ টেরটি পাবে না, এই বাঘের ডাক কার কীর্তি।

ছিরু একদিন গিয়ে রিহারসাল দেখে এসেছে। কাজেই দূরে বসে কানে শুনে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কোন সীন চলছে। আর একখানা বিবেকের গান। তারপরই শ্মশানের দৃশ্য অর্থাৎ বদনের শিয়ালের ডাক।

হঠাৎ ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বলে উঠল মাঠের মাঝে। কে? খুব নজর করে দেখল ছিরু অন্ধকার জনহীন মাঠের ভিতর এক জায়গায় কটা মাথা এবং দু-তিনটে আগুনের বিন্দু। লাল আলোর ফুটকিগুলো মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে—নড়াচড়া করছে। ওখানে বসে হাতের আড়াল দিয়ে কারা বিড়ি বা সিগারেট টানছে। চাপা ফিসফাস কথা কানে এল। ভীত সন্দিগ্ধ ছিরু লক্ষ্য করতে থাকে। চোর-ডাকাত নিশ্চয়। রকম-সকম দেখে তাই ঠাওর হচ্ছে। আর একটু রাত হবার অপেক্ষায় আছে। ওদের লক্ষ্যটা কি? পারুলডাঙা না তাদের গাঁ? রবিপুর হওয়াই সম্ভব। তাঁদের গাঁয়ের বেশির ভাগ জোয়ান পুরুষ গেছে পারুলডাঙায় যাত্রা দেখতে। অরক্ষিত গ্রামে ডাকাতির এই উপযুক্ত সময়।

ছিরু মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল। কি করবে সে? ছুটে গিয়ে পারুলডাঙায় খবর দেবে? যেতে যেতে যদি ডাকাতদের নজরে পড়ে যায়, গুলি খেয়ে মরবে। তার কথা যাত্রার দর্শক যদি বিশ্বাস না করে? লোকজন সজাগ হলে ডাকাত পালাবে। তাদের দেখা না পেলে লোকে ভাববে এ তার যাত্রা ভণ্ডুল করার তাল। অন্তত বদন তাই ভাববে।

রবিপুরে ঢুকেই তাদের বাড়ি। বৃদ্ধ ঠাকুর্দা, মা, স্ত্রী, মেয়ে রয়েছে। সব লুটে নিয়ে যায় যদি ডাকাতে মার ধোর করে? কাঠের মতো বসে থাকে ছিরু আর ভাবে।

বিবেকের গলা ভেসে এল। কর্তব্য স্থির করে ফেলে ছিরু। আলের আড়ালে নেমে গিয়ে লুকিয়ে বসে। তারপর ঝোলার ভিতর থেকে বের করে মাটির হাঁড়িটা। দুহাতে হাঁড়িটা ধরে তাতে নিজের মাথার গোটাটা প্রায় ঢুকিয়ে দিয়ে বুক ভরে দম টেনে সে হাঁক পাড়ল—'আ উ উ ম ম্। উ ম-ম্!'

নিস্তব্ধ ধু ধু মাঠে সেই বিকট গমগমে আওয়াজ অতি ভয়ানক শোনাল। পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল যেন। ফের এক গর্জন—ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের দীর্ঘ লয়ে হুংকারের অবিকল নকল।

'বাপরে'—সমবেত কণ্ঠে আর্তনাদ এবং তারপরই দ্রুত পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে।

উঁকি মেরে দেখল ছিরু, অনেকগুলি ছায়া মূর্তি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে মাঠ দিয়ে। কয়েকজন দৌড়চ্ছে পারুলডাঙার দিকে।

ওদিকে যাত্রার আসর চুপ। টুঁ শব্দটি নেই। এমনি রইল আধমিনিটটাক। এর পর শোনা গেল তুমুল কলরব। বহু কণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার। যেন তাণ্ডব শুরু হয়েছে। হতভম্ব হয়ে গেল ছিরু। পারুলডাঙা থেকে শোনা গেল টিন পেটানোর প্রচণ্ড শব্দ। একটা বন্দুকের আওয়াজ হল। আসর ভেঙে গেছে। অনেক টর্চের আলো ছোটাছুটি করছে। হরিপুরের দিক থেকেও চিৎকার উঠল।

ছিরু বুঝল এখন পারুলডাঙায় যাওয়া নিরাপদ নয়। বাঘ ভেবে তাকে না গুলি করে বসে। সে চুপিচুপি রওনা দিল নিজের বাড়ির দিকে। যেতে যেতে আর একখানা প্রাণভরে বাঘের গর্জন ছাড়ল পারুলডাঙা লক্ষ্য করে।

পরদিন খুব ভোরে বদন ঘোষের বাড়ির দরজায় ঘা দিল ছিরু। ডাকল—'ওহে বদন, দোর খোল। আমি ছিরু।'

বদন সাবধানে দরজা খুলে উঁকি দিল। চকিতে দেখে নিল রাস্তার এমুড়ো থেকে ওমুড়ো। নাঃ, বাঘ নেই। ছিরু ছাড়া বাইরে লোকও নেই একটিও। বাঘের ভয়ে কেউ ঘরের বাইরে পা দেয় নি তখনো। বদন বেরিয়ে এল। দেখাদেখি আরও দু-চার জন! সবার রাত জাগা শুকনো মুখ।

'কোথায় ছিলে রাতে?' ছিরুকে জিজ্ঞেস করল বদন।
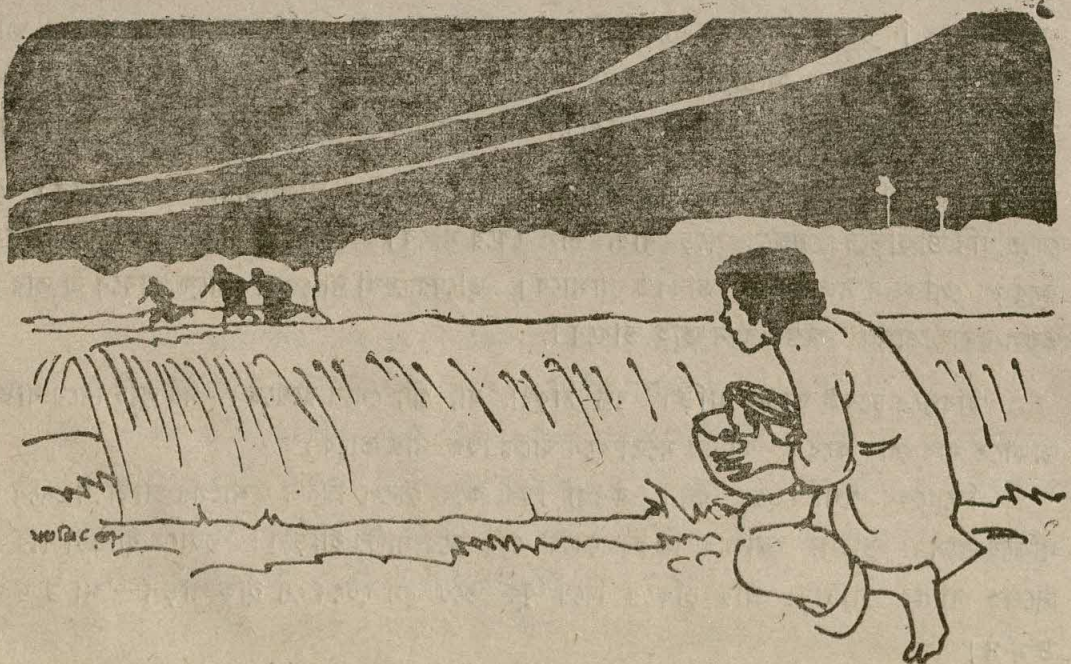
'নিজের ঘরে বিছানায়।'

'যাত্রা শুনতে আসনি ?'

—'না।'

'বাঘের ডাক শোন নি ?'

'শুনেছি বৈকি ! নিজের ডাক নিজের কানে যাবে না ? আমি কি কালা ?'

'মানে !'

'মানেটা পরে বলছি, আগে শুনি ডাকাতগুলোর কি হল ?'

'কে ? কেতু মণ্ডল আর গোলাম আলি ? বাঘ ডাকতেই কোত্থেকে এসে ওরা ছুটে ঢুকল গাঁয়ে। একজনের ঘরে ঢুকে পড়তে আটক করে রেখেছি। তা তুমি জানলে কি করে ? এই যে বললে নিজের বাড়িতে ছিলে রাতে।'

'সে তো পরে গেলাম। হাঁক ছেড়ে ডাকাত তাড়িয়ে—আসর ভেঙে দিয়ে তাপ্পর। যাক, ওদের থানায় জমা দাও। দারোগাবাবুকে বল গিয়ে মাঠে অনেক অস্ত্রশস্ত্র পড়ে আছে ওদের। আরও ছ-সাতটা ছিল দলে। ডাকাতি করতে এসেছিল এখানে-'

'কি বলছো যা তা,' বদনের চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। 'হেঁয়ালি রাখ। ঠিকঠাক্ খুলে বল।'

ছিরু হেসে বলল, 'খোঁজ নিও গিয়ে, সার্কাসের বাঘ বেরয় নি। ওটা আমারই ডাক। শুনবে নাকি আর একবার ? সেই যে ওস্তাদ শিখিয়েছিল। মনে পড়ে ?'

সে হাঁড়িটা বের করে, তার ভিতর মুখ ঢুকিয়ে টেনে এক হুংকার ছাড়ল—'আ উ উ ম ম্—উ ম ম্।'

তার পরেই ছিরু ভীষণ কাশতে শুরু করল।

নারাণ ভাবল, এইবার আমি সব্বাইকে চমকে দেব, যা প্ল্যান একখান এঁটেছি।

নারাণ ওরফে নারায়ণ হচ্ছে একজন বহুরূপী। সামান্য চাষবাস ছাড়াও এ হল তার পৈতৃক বৃত্তি। তার বাবাও ছিল এ তল্লাটের এক নামকরা বহুরূপী।

শরৎকালটা হচ্ছে বহুরূপীদের ভেক ধরার সময়। নারাণ এক একদিন এক একরকম সাজ করে বেরিয়ে পড়ে। নানা গ্রামে গিয়ে চরিত্র অনুযায়ী অভিনয় দেখায়। কোনও কোনও দিন যায় গঞ্জে। সাধারণত হাটে হাটে নারাণের আবির্ভাব হয়। এক এক গ্রামে এক এক বিশেষ দিন হাট বসে। ভিড় জমে। রাক্ষসী, রাবণরাজা, মা-কালী ইত্যাদি বিচিত্র বেশ ধরে নারাণ হাজির হয় সেখানে। হাটের মাঝে খানিক ঘুরে ফিরে পার্বণী আদায় করে। তারপর গ্রামের ভিতরে ঢোকে। গ্রামের মধ্যে নারাণের খুব খাতির, তাকে দেখলেই হৈ হৈ করে ছুটে আসে ছোট ছেলে-মেয়ের দল। কখনো বা তার বিভীষণ মূর্তি দেখে তারা পাঁই পাঁই করে পালায়। গাঁয়ের বৌ-ঝিরাও নারাণ বউরূপীর বেজায় ভক্ত। চাল ডাল তরিতরকারি অনেক কিছু বকশিশ মেলে।

কিন্তু আজকাল গঞ্জে তার দর কমে গেছে। দু'হপ্তা আগে 'বাবা ভোলানাথ' রূপে গিয়েছিল গঞ্জে। তাকে দেখে বাজারের এক বাসনের দোকানের মালিক বলরাম সাউ পাঁচজনার সামনে হো হো করে হেসে বলেছিলেন—'কিগো নারাণ, এবার নতুন সাজ টাজ দেখাও! ওই কটা ভেক নিয়ে আর কদ্দিন চালাবে? চোখের অরুচি হয়ে গেল যে। তুমি বাপু অমন বাপের নাম ডোবালে—তার সাজ তো দেখেচি। ফি বছর নতুন পার্ট। না জানলে ধরে কার সাধ্যি।'

নারাণের ভারি আঁতে লেগেছিল কথাগুলো। তারপর থেকে সে ভেবেছে, একটা নতুন কিছু করব—দেখিয়ে দেব গঞ্জের লোককে—ওঃ ভারি দেমাক।

আইডিয়াটা মাথায় খেলেছিল দৈবাৎ।

বৃহস্পতিবার গঞ্জেও বড় হাট বসে। নারাণ গিয়েছিল কেনাকাটি করতে। সেদিন আর সে বহুরূপী সাজে নি—ইচ্ছে হয় নি। ফিরছিল থানার গা ঘেঁষে। দেখল, একটা লরি দাঁড়িয়ে থানার বড়বাবুর কোয়ার্টারের সামনে—নামছে খাট-পালং, বাক্স-প্যাঁটরা।

একজন সেপাইকে শুধাল সে—'কে এলেন বটে?'

'নতুন দারোগাবাবু। পুরনো দারোগা টানসফর হয়ে গেলেন যে', উত্তর দিল সিপাই।

নারাণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। আর তখুনি এই প্ল্যানটা তার মনে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিল।

তাদের এই মফঃস্বল এলাকায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হলেন থানার দারোগা। হ্যাঁ, এই দারোগাবাবুরই বেশ ধরবে নারাণ।

বড়বাবু মানে দারোগাবাবুর চেহারাটি সে দেখল খুঁটিয়ে। পুলিশের ড্রেসে তিনি মালপত্র নামানোর তদারক করছেন। লম্বা তারই মতন। নিটোল ভুঁড়িটি কাপড় জড়িয়ে বানাতে অসুবিধে নেই। তবে অমন চাকার মতো গালফুলো মুখখানা সে পাবে কোথায়? তাঁর পুরুষ্টু গোঁফ জোড়াটির বাহার সে মনে মনে এঁকে নিল। মাথায় টাক না চুল নিয়ে হাঙ্গামা নেই, টুপি তো থাকবে। দারোগা বাবুর চলন বলনও মোটামুটি মুখস্থ করে নিল নারাণ।

গণ্ডগোল পাকালো অভিলাষ। অভিলাষ নারাণের সাকরেদ। নারাণ রাম সাজলে অভিলাষ সাজে হনুমান। সীতা সাজলে হয় চেড়ি। কিন্তু ইদানীং ওর মতিগতি যে পালটাচ্ছে সেটা অনুমান করলেও এতটা আশা করে নি। আসলে গত বছর হনুমান সেজেই ওর মাথাটি বিগড়েছে। দর্শকরা রামের চেয়ে হনুমানের লম্ফঝম্পকেই বেশি বাহবা দিয়েছে। ফলে অভিলাষের লেজ মোটা হয়েছে এবং এখন তার ধারণা—আমিই বা কম কিসে?

সঙ্গে একটা সেপাই না থাকলে দারোগার মান থাকে না।

নারাণ অভিলাষকে বলেছিল, 'তুই হবি আমার সেপাই—কনেস্টবল।'

অভিলাষ একটু গোঁজ হয়ে থেকে বলল, 'কেন দু'জনাই দারোগা সাজলে ক্ষেতি কি?'

'ধ্যুৎ বোকা, এক থানায় দুটো দারোগা—শুম্ভু নিশুম্ভুর যুদ্ধ বেধে যাবে না? এক সিংহাসনে দুটো রাজা—শুনেছিস কখনো?

অভিলাষ ঘাড় নিচু করে রইল—হাঁ না করল না। বোঝা গেল সেপাই সাজতে তার ইজ্জতে বাধছে। একটা লড়াই-টড়াই থাকলে না হয় কিছুটা এলেম দেখানোর সুযোগ থাকে, কিন্তু এতো কেবল —হুজুর হুজুর বলা, সেলাম ঠোকা আর হুকুম তামিল করা।

মরুগগে অভিলাষ! সেপাই ছাড়াই আমি দারোগা হব। নারাণ তোড়জোড় শুরু করে দিল। দেরী করা চলবে না। এখনও নতুন দারোগার মুখ তেমন চেনা হয়নি—খবরটা লোকের কানে গেছে মাত্র। এই মওকা। পরশু দিনই দুগ্‌গা বলে কাজে নেমে পড়া যাক।

নারাণের গ্রাম গঞ্জ থেকে দূরে। হেঁটে ঘন্টাখানেকের পথ। গ্রাম থেকে সাজ করে বেরুনো

মুশকিল। গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো পিছনে লাগবে—সঙ্গে সঙ্গে আসবে। ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে যাবে। নারাণ ঠিক করল গঞ্জের সব চেয়ে কাছের গ্রাম নিত্যানন্দপুরে কাটাবে আগের রাত। পরদিন সকালে সে দারোগার সাজে ঢুকবে গঞ্জের বাজারে। নিত্যানন্দপুরে তার বন্ধু থাকে মদন ঘোষ। মদনের বাড়ির বৈঠকখানায় শোবে।

একটা বড় থলেতে মেক-আপ-এর জিনিসপত্র ভরে নারাণ সন্ধ্যাবেলা হাজির হল মদনের বাড়ি। মদনকে বলল, 'কাল ভোরে বউরূপী সেজে ঢুকব গঞ্জে, দারুণ একখান সাজ ভেবেছি। তাই রাতটা তোমার এখানে কাটাব বলে এলেম। গঞ্জেও তাড়াতাড়ি পৌঁছন যাবে।'

মদন বন্ধুকে পেয়ে মহা খুশি। কৌতূহলী হয়ে বার বার জানতে চাইল, 'কিসের সাজ বটে হে?'

নারাণ মিটিমিটি হেসে বলল, 'এখন বলব না ভাই, কাল দেখবে'খন। হ্যাঁ বাড়ির লোককে ভেঙো না খবরটা। চা-টা দেওয়ার জন্যে কারও আসার প্রয়োজন নেই সকালে।'

মদন কাল খুব ভোরে বাসে চড়ে বেরিয়ে যাবে। মহকুমা শহরে তার জরুরী কাজ। ফিরবে দুপুরে। সে বলল, 'ড্রেস খুলে ফেল না কিন্তু। ফিরে এসে দেখব।'

উত্তেজনায় নারাণের ভাল ঘুম হল না রাতে।

পরদিন কাক ভোরে উঠে পুকুরে হাত-মুখ ধুয়ে এসে, কয়েক মুঠো মুড়ি খেয়ে নিয়ে সে মেক-আপ করতে বসল।

গ্রামে ঢোকার মুখে বাস চলাচলের পিচ রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান। নারাণ ভাবল—যাই গলাটা ভিজিয়ে নিই। সাজটারও পরীক্ষা হয়ে যাক। পরণে খাকি ট্রাউজার্স-সার্ট, পায়ে মোজা-বুট, মাথায় ক্যাপ, হাতে ব্যাটন—মস্‌মসিয়ে দোকানে ঢুকে ভারি গলায় বলল নারাণ, 'এক কাপ চা দেখি।'

হতচকিত হয়ে দোকানদার লাফ দিয়ে উঠে হাতজোড় করে বলল, 'এ্যাঁ স্যার আপনি? এই যে স্যার, বসুন স্যার।'

সে শশব্যস্ত হয়ে একটা হাতল-ভাঙ্গা চেয়ার তুলে এনে রাখল বাইরে। বোঝা গেল নারাণকে সে নতুন দারোগা ঠাউরেছে।

দোকানের কোণে বেঞ্চিতে বসে একটি মাত্র খদ্দের চা খাচ্ছিল। আচমকা দারোগার দর্শনে তার হাতের চায়ের কাপ গেল উলটে। সুড়ুৎ করে সে সরে পড়ল পিছনের দরজা দিয়ে।

দোকানী নিজে হাতে গামছা আছড়ে চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে নারাণকে বসিয়ে বলল, 'স্যার বিস্কুট দিই ক'খানা? ভাল খাস্তা বিস্কুট আছে—একেবারে ফ্রেস। আর মামলেট একটা ডবল ডিমের?'

'উঁহু, শুধু চা।' গম্ভীর ভাবে জানাল নারাণ।

পুরণো লিকার ফেলে দিয়ে নতুন চা পাতা বের করতে করতে দোকানদার চেঁচাল—'ওরে এককড়ে, চট করে টাটকা দুধ নিয়ে আয় এক গেলাস। আর ঘুরে এসে কাপ প্লেটগুলো ধুয়ে দে গরম জলে।'

অমনি দোকানের ছোকরা কর্মচারিটি পড়ি কি মরি করে মগ হাতে দিল ছুট।

ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে বসে গরম চায়ে তরিবত করে চুমুক দিচ্ছে নারাণ। সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছে দোকানী।

'হেঁ হেঁ, আপনি তো স্যার নতুন এলেন ?'

'হুম্।'

'এত সকালে ইদিকে স্যার, কাজ ছিল বুঝি ?'

'হুম্।'

দারোগা বাবুর অটল গাম্ভীর্য দেখে দোকানীর কাঁপুনি বেড়ে গেল। —'এক পিস রুটি দেব স্যার টোস্ট করে ?'

'না।'

দোকানী অগত্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে থাকে। পুলিশকে তার যমের মতো ভয়। ইনি আবার খোদ বড়কর্তা। নানা অশুভ চিন্তা তার মনে জাগে।

নারাণ ভারি উপভোগ করছিল ব্যাপারটা।

মনে মনে সে ভাবছিল—বাঃ সাজখানা জব্বর হয়েছে। কেউ টের পায়নি। দোকান থেকে বেরিয়ে একবার গ্রামে টহল দেবে নারাণ। প্রথমেই হারুর দরজায় গিয়ে হাঁক ছাড়বে—কৈ হারু আছ নাকি ?

হারু সিঁধেল চোর। মাঝে মাঝে জেল খাটে। কাজেই সাত সকালে দারোগাবাবুকে দেখে নির্ঘাৎ তার পিলে চমকে যাবে। সেদিন সাউয়ের দোকানে হারুও ছিল। তাকে নিয়ে সাউমশায় যখন ঠাট্টা করল খুব হেসেছিল হারু। আজ তার শোধ তুলবে নারাণ।

অবশ্য এ গাঁয়ে অনেকেই তাকে ভাল রকম চেনে। কিছুক্ষণের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবে তার পরিচয়। কিন্তু তার আগেই সে হুলুস্থূল ফেলে দেবে গ্রামে।

নিত্যানন্দপুর থেকে মদনের সাইকেলটা চেপে সে সোজা চলে যাবে গঞ্জে, সাউয়ের দোকানে গিয়ে ডেকে বলবে 'আপনি তো বলরাম সাউ ? নমস্কার। নতুন জয়েন করলাম আপনাদের থানায়। এসেছিলাম ইদিকে, আপনার নাম শুনেচি। ভাবলাম একটু আলাপ করে যাই।'

বলরাম সাউ লোকটা মোটে সৎ নয়। বদনাম আছে, নাকি চোরাইমালের কারবার করে লুকিয়ে। কাজেই হঠাৎ দারোগার আবির্ভাবে সাউ কেমন ঘাবড়ে যাবে ভাবতে নারাণের আমোদ লাগল। অতঃপর দারোগার আসল পরিচয় যখন পাবে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাবে সাউমশায়ের।

বাজারে এক চক্কর দিয়ে একবার থানায় ঢুঁ মেরে এলে কেমন হয় ? নতুন দারোগার সামনে গিয়ে সেলাম ঠুকে বলবে—'স্যার, আমি হলুম গে নারাণ বহুরূপী। আপনার প্রজা হুজুর। সাজ দেখাতে এলেম।'

দারোগাবাবু খুব অবাক হয়ে যাবে গোড়ায়। তারপর নিশ্চয় হেসে তারিফ করবে তার সাজের। বকশিশ দিয়েও ফেলতে পারে।

নাঃ থাক, নারাণ ফের চিন্তা করল, থানার বড়বাবুর সাক্ষাতে যাওয়া উচিত হবে না। অত বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। যদি বেমক্কা চটে যায়।

হঠাৎ—ঘ্যাঁচ।

শব্দের কারণ ঘাড় ফিরিয়ে দেখেই নারাণের চক্ষু চড়ক গাছ। পিচ রাস্তায় একটা জীপগাড়ি এসে থেমেছে। এবং জীপের ড্রাইভারের পাশে বসে স্বয়ং নতুন দারোগা হাঁ করে দেখছেন নারাণকে। পিছনে বসে আছে একজন কনস্টেবল এবং গ্রামের চৌকিদার।

নারাণ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তার চায়ের কাপ গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তাড়াতাড়ি গিয়ে সে দারোগাবাবুর সামনে করজোড়ে দাঁড়াল।

'কে আপনি ? দারোগাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'আজ্ঞে হুজুর, আমি আমি'—নারাণের গলায় আর স্বর ফোটে না।

চৌকিদার অবশ্য চিনেছে। সে বলল, 'হুজুর ও নারাণ বউরূপী। সঙ সেজেছে। মানে ইয়ে দারোগাবাবুর সাজ করেছে।'

'এ্যাঁ, আচ্ছা বেয়াদপ ! এ্যাই, এই ড্রেস পেলে কোথা ?'

'আজ্ঞে যাত্রা পার্টির, ভাড়া করেছি। ভাবলাম বেশ মজা হবে।'

দারোগাবাবু হু'জনার পোশাক এক নজরে মিলিয়ে দেখলেন। নকল দারোগার পোশাক অনেক

বেশি নতুন। তার সার্ট-প্যান্টের ইস্ত্রির ভাঁজ বেশি কড়া। তার পেতলের ব্যাজ, বুটের পালিশ কোমরের বেল্ট আসল জনের চেয়ে ঝকঝকে চকচকে।

ফলে নতুন দারোগার মাথা চড়ে গেল। কটমট করে চেয়ে বললেন, 'বটে, চল থানায়, বের করছি মজা! বিষ্টু দারোগাকে চেন নি। সব ঢিট করে দেব। এ্যাই পাঁড়ে, এই লোকটাকে গাড়িমে উঠাও।'

কনস্টেবল পাঁড়ে অমনি এক ধাক্কায় নারাণকে গাড়ির পিছনের সিটে চালান করে দিল।

চায়ের দোকানী হতভম্ব হয়ে দেখছিল কাণ্ড। সে এবার হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে বলল, 'স্যার আমার পয়সা?'

'কিসের পয়সা?' আসল দারোগা জানতে চাইলেন।

'আজ্ঞে চায়ের।'

দারোগার সামনে বেচারা দোকানীর ভাষা গুলিয়ে গেল। নারাণ যে চা খেয়েছে কিন্তু দাম দেয় নি সেটা ঠিক বোঝাতে পারল না। এদিকে নতুন দারোগা ভাবলেন তাঁর কাছে বুঝি চায়ের দাম চাইছে দোকানী। তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন—'শাট-আপ্। ড্রাইভার স্টার্ট।'

দোকানী সাত হাত তফাতে ছিটকে পড়ল। তার আর কথা জোগাল না। জীপ বাঁক নিয়ে গ্রামে ঢুকে সটান হারুর বাড়ির দোরগোড়ায় থামল। কনস্টেবল নেমে হারুর সদর দরজার বন্ধ কপাটে দমাদ্দম লাগাল লাথি।

'কেরে বেটা?' হারু গালাগালি দিতে দিতে দরজা খুলে ভূত দেখার মতন আঁতকে উঠল। শুধু থানার সেপাই নয়, গাড়িতে বসে আছে এক সাথে জোড়া দারোগা!

নতুন দারোগা গাড়ি থেকে নামলেন এবং চৌকিদার ও সেপাই সমেত হারুর বাড়ির ভিতরে ঢুকলেন। গাড়িতে রইল নারাণ ও ড্রাইভার।

ভয়ে তখন নারাণের হাত-পা ঠাণ্ডা হবার জোগাড়। সে জিজ্ঞেস করল, 'ড্রাইভার সাব, কি ব্যাপার?'

ড্রাইভার নারাণকে চেনে। বলল, 'কাল রাতে চুরি হয়েছে গঞ্জে, সাহাদের বাড়ি।'

'ও, হারু বুঝি?'

'না। অন্য লোককে আটক করেছে সন্দ করে কিন্তু চোরাই মাল পাওয়া যাচ্ছে না। খুঁজছে'—

'ড্রাইভারসাব, আমার কি হবে? কি করবে আমায়?' নারাণের গলা ধরে যায়।

'কি আর করবে, দু-চার ঘা দিয়ে ছেড়ে দেবে। তোরও বলিহারি আক্কেল বাপু, আর সাজ পেলি না? নতুন দারোগা লোক খারাপ নয়। তবে আসতে না আসতেই চুরি। তার ওপর চোরাই মালের হদিস মিলছে না। মেজাজটা তাই খিঁচড়ে আছে।'

অনেকক্ষণ বাদে দারোগা সদলবলে হারুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখে বোঝা গেল চোরাইমালের খোঁজ পাওয়া যায় নি। নারাণের ওপর চোখ পড়তেই তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।—'ইউ বউরূপী। সঙের মতো বসে যে? খোল্ ড্রেস।'

তক্ষুনি নারাণ টুপি খুলে, হেঁচকা টানে জামা খুলে, খালি গা হয়ে গেল। তাড়াহুড়োয় জামার বোতামে আটকে তার আধখানা গোঁফ এল উপড়ে। নারাণ ও পুলিশের লোকজন নিয়ে জীপ আবার গ্রাম ছেড়ে পিচ রাস্তায় উঠল।

নারাণ কাঠ হয়ে আছে। মনে মনে কেবল জপছে—'হে মা দুগ্‌গা ; দুগ্‌গতিনাশিনী, অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়াটা কাটিয়ে দাও মা।' —ইস্, তার বরাত ভারি মন্দ। চুরির কেসটা না হলে দারোগাবাবু হয়তো এত চটত না—

এই সময় নারাণের ঝট করে মনে পড়ে গেল একটা কথা। সে কাঁপা গলায় ডাকল—'হুজুর।'

'কি ?'

'ওই চায়ের দোকানে আমি যেই মাত্তর ঢুকেছি, একটা লোক হুজুর আমায় দেখে'—

'কি ?'

'মানে আমায় দেখেই পালাল।'

'কেন ?

'মানে ও ভেবেছিল বুঝি সত্যি দারোগাবাবু।'

'বটে ? আবার নিজের গুণ গাওয়া হচ্ছে ?' দারোগাবাবু গর্জন ছাড়লেন।

নারাণের হাঁটু ঠকঠক করছে। তবু মরিয়া হয়ে বলে ফেলল—'না হুজুর, মানে, আমি বলছিলাম যে লোকটার মনে নিশ্চয় পাপ ছেল। নইলে পালাবে কেন ?'

এইবার দারোগা ক্লু-টা ধরতে পারলেন। ঘাড় ফিরিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'চেন লোকটাকে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিনাথ। হারুর জ্ঞাতি। লোকটা সুবিধের নয়।'

অমনি চৌকিদার সায় দিল, 'ঠিক কথা হুজুর, ছিনাথের ঘরটা একবার দেখে এলে হয়।'

'এতক্ষণ বলনি কেন, ঘুমুচ্ছিলে ?' তেড়ে উঠলেন দারোগা।

'ড্রাইভার গাড়ি ঘোরাও, ছিনাথের বাড়ি চল। কুইক্।'

ছিনাথ দু-হাতে দুই পেল্লাই ঝোলা নিয়ে গুটি গুটি আসছিল গাঁয়ের পথে। হঠাৎ পুলিশের গাড়ি তার রাস্তা আটকে দাঁড়াতে থতমত খেয়ে গেল।

'কি আছে ঝোলায় ?' দারোগা প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে বেগুন আর শাক, বেচতে নিয়ে যাচ্ছি হাটে,' বলল ছিনাথ। সত্যি সত্যি তার একটা ঝুলির মুখে বেগুন এবং অন্যটায় নটে শাক উঁকি মারছিল।

'পাঁড়ে, ওর ঝুলি সার্চ কর।' হুকুম দিলেন দারোগা।

পাঁড়ে গাড়ি থেকে নামামাত্র ছিনাথ ঝুলি ফেলে মারল টেনে দৌড়। 'পাকড়ো পাকড়ো'—বলে চেঁচাতে চেঁচাতে পাঁড়েও তৎক্ষণাৎ তার পিছু ধাওয়া করল। ব্যাস্ দু'জনেই হাওয়া।

মিনিট দশেক পরে কনস্টেবল পাঁড়ে এবং কয়েকজন গ্রামের লোক মিলে ছিনাথকে বন্দী করে গুঁতো মারতে মারতে হুজুরের সামনে এনে হাজির করল। ছিনাথের ঝুলিতে বেগুন আর শাকের আঁটির

তলায় আবিষ্কার হল হরেক রকম জিনিস—ট্রানজিসটার রেডিও, ঘড়ি, বাসন-কোসন ইত্যাদি—সব সাহাবাড়ির চোরাইমাল।

দারোগাবাবুর মুখ খুশিতে উজ্জল হয়ে উঠল। ছিনাথের ঘাড়ে এক মোক্ষম রদ্দা কষিয়ে বললেন—'তবে রে শয়তান!'

চোরাইমাল ও আসামী সমেত পুলিশের জীপ এবার সবেগে রওনা দিল গঞ্জের উদ্দেশে।

নিত্যানন্দপুর সবে ছাড়িয়েছে। দারোগাবাবুর নজর পড়ল নারাণের দিকে। অমনি অর্ডার দিলেন—'ড্রাইভার, রোক্‌কে।'

থামল গাড়ি।

দারোগা চোখ পাকিয়ে নারাণকে বললেন,—'নেমে পড়।'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে নারাণ আমতা আমতা করে—'আজ্ঞে স্যার নেমে যাব? মানে—ইয়ে, চলে যাব হুজুর?'

'আলবৎ! ভেবেছো কি? গাড়ি চড়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াবে? ভারি ফূর্তি, না? গেট আউট'—

ব্যাস, নারাণ হুড়মুড়িয়ে লাফিয়ে পড়ল গাড়ির বাইরে।

'এ্যাও।' দারোগার হাঁক শুনে নারাণ আবার পাথর।

'আজ্ঞে?' নারাণ কাঁদ কাঁদ। হেই বাপ, ফাঁড়াটা যে কেটেও কাটে না!

গোঁফে তা দিতে দিতে আড় চোখে নারাণের দিকে তাকিয়ে দারোগা গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আর কিছু সাজতে পার?'

'আজ্ঞে অনেক কিছু—মাকালী, শ্রীকৃষ্ণ, রাবণ রাজা'—

'বেশ। কেষ্ট সেজে একদিন যেও আমার বাসায়। গিন্নীমাকে দেখিয়ে এস। বকশিশ মিলবে। কিন-তু'—দারোগা আবার চোখ পাকালেন—'ফের যদি শুনি এই ড্রেসে'—

'আজ্ঞে না হুজুর, কক্ষনো না।' নারাণ রাস্তার ওপর সটান শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে পেন্নাম জানাল দারোগাবাবুকে।

হুস্‌ করে বেরিয়ে গেল জীপ।

॥ ১ ॥

রেডারের পর্দার ওপর চোখ রেখে বসে ছিলেন প্রফেসর রঞ্জন রায়। পর্দার বুকে ফুটে উঠেছে থালার আকারের একটি লালচে উজ্জ্বল বস্তু। বস্তুটি মহাশূন্যে ভাসমান এক গ্রহ। ওই অজানা গ্রহকে লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে তাঁদের মহাকাশযান। ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে ওর রূপ! বোঝা যাচ্ছে উঁচু নিচু বন্ধুর ভূ-পৃষ্ঠ। কতগুলো কালো রঙের ছোপ ছোপ আর সরু সরু রেখা। কি ওগুলো? বোধ হয় জলাশয়ের চিহ্ন।

বৈজ্ঞানিক রঞ্জন রায়ের বাইরে শান্ত নির্বিকার চেহারা দেখে কল্পনা করা শক্ত তাঁর হৃৎস্পন্দন কত উত্তাল হয়ে উঠেছে। চাপা উত্তেজনায় অস্থির তাঁর মন।

নতুন গ্রহে পদার্পণ করার অভিজ্ঞতা প্রফেসর রায়ের এই প্রথম নয়। আরও দু'বার তিনি মহাশূন্যে পাড়ি দিয়ে নব আবিষ্কৃত গ্রহের মাটিতে পা দিয়েছেন। এবারের মতোই মহাকাশযানের মধ্যে বহুদিন বন্দী হয়ে থেকে সহ্য করেছেন একঘেয়েমীর কষ্ট, নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা। বরণ করেছেন নানা অজানা বিপদকে। তবে অভিযানের ফলাফল নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মেটানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু এবারের সঙ্গে অন্যবারের তফাৎ আছে। এক নতুন গ্রহের সঙ্গে পরিচিত হতে এমন ব্যক্তিগত আশা-নিরাশার দোলা তিনি আগে কখনো অনুভব করেন নি।

সীমাহীন ধু-ধু মহাশূন্যের কোলে দুটি বছরের অবিরাম যাত্রা এবার সমাপ্ত হতে চলেছে। প্রক্সিমো! পৃথিবীর সৌরমণ্ডলের কাছাকাছি এই নব আবিষ্কৃত গ্রহকে ঘিরে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে কত জল্পনা-কল্পনা, বাদানুবাদ! আলোকরশ্মির গতিতে প্রচণ্ড বেগে ছুটছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ-গবেষণা-সংস্থার এই ফোটন রকেট। প্রতি মুহূর্তে প্রক্সিমোর নিকট হতে নিকটতর হচ্ছে। আশ্চর্য। মাত্র পঁচিশ বছর আগে এই গ্রহ প্রথম ধরা পড়ে পৃথিবীর টেলিস্কোপে। একটা ধূমকেতু এই অঞ্চল দিয়ে চলে যায়। তারপরই আবিষ্কার হয় এই গ্রহের অস্তিত্ব। বোধ হয় কোনো গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে প্রক্সিমোকে এতকাল আড়াল করে রেখেছিল। ধূমকেতুর অবির্ভাবে ওই আবরণ সরে গেছে।

পৃথিবী থেকে নানা ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এই গ্রহকে। তবে এখানে মানুষের আগমন এই প্রথম।

ওঃ, অনেক চেষ্টায় রঞ্জন রায় প্রক্সিমো-এক্সপিডিসনে অংশ গ্রহণ করতে পেরেছেন। বৈজ্ঞানিক রায় নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলেন। এই অভিযানে আসতে না পারলে তিনি দারুণ হতাশ হতেন।

'আমরা পৌঁছে গেছি ডক্টর রায়।'

অ্যালেনের গলা শুনে রায় ঘাড় ফেরালেন। অ্যালেনের মুখ আগ্রহে জ্বলজ্বল করছে। সে বলল, 'আর পাঁচ ছয় ঘণ্টা মাত্র বাকি, পাইলট তাই জানাল।'

'ও'—রায় মাথা ঝাঁকালেন।'

'আচ্ছা প্রফেসর, এই গ্রহে কি প্রাণের সম্ভাবনা আছে?'

রায় ভুরু কুঁচকে তাকালেন অ্যালেনের দিকে। প্রাচীন গ্রীক দেবমূর্তির মতো সুন্দর ওর গঠন। চটপটে আমুদে স্বভাব। বয়স ত্রিশ বছর। তাঁর চেয়ে প্রায় বছর পনেরোর ছোট। যন্ত্রবিদ্যায় অসামান্য কুশলী। সঙ্গী হিসাবে অ্যালেনকে ভালই লাগত। কিন্তু ইদানিং রঞ্জন রায়ের ওকে পছন্দ হচ্ছে না। প্রক্সিমো সম্বন্ধে ওর অতিরিক্ত কৌতূহল রায়ের বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছে। তিনি আপাতত অ্যালেনকে এড়িয়ে চলেন। অ্যালেনের ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তরে অতি নিস্পৃহভাবে রায় বললেন—'কে জানে।'

অ্যালেন দমল না। উৎসাহিত স্বরে বলল—'আমার তো মনে হয় আছে। নিশ্চয়ই কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ আছে ওই গ্রহে। যা শুনেছি প্রক্সিমোর আকার ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর চেয়ে সামান্য কম। এর আবহমণ্ডল জীবনধারণের অনুকূল। এবং ওখানে জল আছে। অবশ্য যন্ত্রের পাঠানো খবর যদি সত্যি হয়। যাক, এবার আমরা সত্যি মিথ্যে হাতে নাতে যাচাই করে দেখব, কি বলেন রায়?'

'হুঁ', রায় থমথমে মুখে রেডারের পর্দার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। অ্যালেনের সঙ্গে আর কথা বলতে তাঁর ইচ্ছা নেই। ঠিক ভরসাও হয় না। রায় ভাবেন, ও কি আমার কাছ থেকে কোনো খবর আদায় করতে চায় প্রক্সিমো সম্বন্ধে? কিন্তু মুখের ভাব দেখে তো কিছু বোঝার উপায় নেই। হয় ছেলেটা নিতান্ত সরল, একটু বেশি বকে এই যা দোষ। আর তা নইলে ও একজন অতি নিপুণ চতুর অভিনেতা। যাই হোক রায় অ্যালেন সম্পর্কে সতর্ক হয়ে গেছেন।

॥ ২ ॥

মহাকাশযানের গা থেকে নামানো লম্বা সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামছে দুটি মূর্তি। সারা দেহ স্পেস স্যুটে আচ্ছাদিত, রঞ্জন রায় এবং ক্রস অ্যালেন। প্রক্সিমোর মাটিতে প্রথম পা ছোঁয়ালেন রায়, তারপরই অ্যালেন।

এই স্পেস স্যুটকে আজও ঠিক মানিয়ে নিতে পারেন নি বৈজ্ঞানিক রায়। বড্ড জবড়জং ব্যাপার। অস্বস্তি হয়। কিন্তু মহাকাশ চারীর এই কিম্ভূত পোশাকের ভিতর না ঢুকেই বা উপায় কি ? যেটুকু জানা গেছে, এই গ্রহে অক্সিজেন আছে। নাইট্রোজেন আছে, আছে হাইড্রোজেন, মিথেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস ও জলীয় বাষ্প। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলও মোটামুটি এই সব গ্যাসীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী। প্রক্সিমোর বায়ুমণ্ডলে পৃথিবীর তুলনায় হাইড্রোজেনের ভাগ অনেক বেশি, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন সামান্য। মিথেন ও এমোনিয়া আছে যথেষ্ট পরিমাণে। সূর্যের আলট্রা-ভায়লেট রশ্মির বিকীরণ এখানে বহুগুণ জোরাল। অতি প্রাচীন কালে পৃথিবীর আবহাওয়া হয়তো অনেকটা এই রকম ছিল। আধুনিক মানুষের খোলা শরীর এই পরিবেশ সহ্য করতে পারবে না, তাই স্পেস্ স্যুটের সাবধানতা। স্পেস্ স্যুট বা মহাকাশচারীর আবরণের ভিতর পৃথিবীর মানুষের দেহযন্ত্রকে স্বাভাবিক ভাবে চালনা করার সমস্ত ব্যবস্থা আছে। অজানা গ্রহের কোনো ক্ষতিকর প্রভাব থেকে এই পোশাক মানুষকে রক্ষা করে।

দু'জনে চারপাশে ভাল করে দেখে নেয়।

একটা প্রান্তরের মধ্যে নেমেছে মহাকাশযান। প্রস্তরময় ভূমি। লাল, হলুদ, কালো, সাদা কতরকম শিলা-খণ্ড ছড়ানো। বাঁ দিকে নিচু এক পাহাড়। অন্য গ্রহে নেমে বৈজ্ঞানিক রায়ের প্রথমেই যে কথাটা মনে হয়েছে আজও সেই কথাটা মনে জাগল—সবুজের অভাব। কোথাও এটুকু সবুজের চিহ্ন নেই। নেড়া পাথর ও বালি। উদ্ভিদহীন কঠিন ডাঙ্গা। তবে এ গ্রহে জল আছে। আকাশ থেকে স্বচক্ষে লক্ষ্য করেছেন। তাই আশা হয় ভবিষ্যতে কোনদিন এখানে সবুজের প্রলেপ পড়বে, উদ্ভিদ দেখা দেবে।

প্রক্সিমোর সূর্য এখন সোজাসুজি মাথার ওপর। বেলা দ্বিপ্রহর, সুউচ্চ মনুমেণ্টের মত খাড়া দাঁড়িয়ে আছে মহাকাশযান। প্রখর সূর্য-কিরণে চকচক করছে তার রূপালি ধাতব দেহ। হিসেব মতো ডানদিকে মাইলখানেকের মধ্যে একটি হ্রদ পাওয়া যাবে। রঞ্জন রায় সেই দিকে পা চালালেন।

অ্যালেন সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

সোজাসুজি কথা বলার উপায় নেই। বেতার গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্রের মাধ্যমে পরস্পরে কথা বলার ব্যবস্থা। রায় বললেন 'অ্যালেন, তুমি কাজে লেগে যাও। আমি ঘুরে দেখছি দরকার হলে ডেকো।'

'আমিও খানিক দেখি ঘুরে, তারপর কাজ।' অ্যালেনের উৎফুল্ল কণ্ঠ ভেসে আসে।

আচ্ছা আপদ জুটল! বেজার মনে রায় এগোলেন। অ্যালেনের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রক্সিমোর বুকে কয়েকটা ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্র স্থাপন করা। সেগুলি পৃথিবীতে নানান তথ্য পাঠাবে। রায়ের কর্তব্য এখানকার আবহাওয়া মাটি পাথর ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ পরীক্ষা করা। তবে দরকার মতো দু'জন দুজনকে সাহায্য করবে! কিন্তু সাহায্য চাইলে সে প্রশ্ন উঠবে। আর পাইলট বাইরে বেরোবে না। সে মহাকাশযানের ভিতর মেরামতিতে ব্যস্ত থাকবে।

যেতে যেতে রায় হাতে বাঁধা গাইগার কাউন্টারের ওপর দৃষ্টি ফেলেন। কাঁটাটা ঘুরছে, থিরথির করে কাঁপছে।

অর্থাৎ এখানকার জমিতে যথেষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে। থার্মমিটারে যে তাপমাত্রা উঠছে তা পৃথিবীর মানুষের পক্ষে ক্লেশকর হলেও একেবারে অসহ্য হবে বলা যায় না।

দু'জনে হ্রদের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন। হ্রদটা চওড়ায় চার-পাঁচ মাইল, লম্বা কতটা বোঝা যাচ্ছে না, নীল জলরাশি, মৃদু বাতাসে ছোট ছোট তরঙ্গ উঠছে।

অ্যালেনের কণ্ঠ ভেসে আসে—'কি অদ্ভুত। শুধু জল। জলে মাছ, ঝিনুক কিছুই নেই। তীরে বালিতে কোন জীবের খোলা বা হাড় পড়ে নেই দেখেছেন?'

রায়ও ইতিমধ্যে তা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি জলের বুকে আঁতিপাতি করে খুঁজতে শুরু করেন। হঠাৎ লক্ষ্য করলেন অ্যালেনও একদৃষ্টে দেখছে জলের দিকে, তিনি চট করে জলের কাছ থেকে সরে একটা পাথরের স্তূপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

একটু পরে অ্যালেন জানাল, 'আমি চললাম প্রফেসর রায়।'

রায় খুশি হয়ে জবাব দিলেন, 'বেশ। আমি আপাতত নমুনা সংগ্রহ করব, ছবি তুলব, ঘণ্টা তিন পরে ফিরব মহাকাশযানে।'

রঞ্জন রায় যখন মহাকাশযানে ফিরলেন, প্রক্সিমোয় তখন সন্ধ্যা নামছে। আকাশের রং সিঁদুরে লাল থেকে ক্রমে বেগুনী হয়ে উঠছে। কেবিনে স্পেস্‌-স্যুট খুলে খাবার ঘরে গেলেন। একটু পরে এল অ্যালেন ও পাইলট। তারা এই নতুন গ্রহ নিয়ে গল্প জুড়ে দিল। রায় গাল গল্পে যোগ দিলেন না। একবার অ্যালেন বলল, 'জানেন প্রফেসর, আগের রকেটে করে যে সব যন্ত্রপাতি প্রক্সিমোয় পাঠানো হয়েছিল, তার কোনো হদিস পেলাম না এধারে।'

'হয়তো অন্যধারে আছে।' নীরস কণ্ঠে উত্তর দিলেন রায়।

চুপচাপ খাওয়া শেষ করে অ্যালেনদের কাছে বিদায় নিয়ে রায় ঢুকলেন ল্যাবরেটরিতে। মনে মনে ভাবলেন, একটা দিন কেটে গেল। এখানে তাঁদের মেয়াদ মাত্র পাঁচটি দিন ও রাত। তারপর ফেরার পালা। এই সামান্য সময়ে এত বড় গ্রহের কত টুকু বা খোঁজা সম্ভব? হয়তো যা সন্ধান করছেন তা সত্যিই আছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। তাই চেষ্টা করতে হবে প্রাণপণে।

দ্বিতীয় দিনও রায় এবং অ্যালেন ধারে কাছে ঘুরলেন। সন্ধ্যের আগে ফিরলেন মহাকাশযানে। রাতে ক্লান্ত রায় বাংকের নরম বিছানায় বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আরও একদিন কাটল, বৃথা।

॥ ৩ ॥

তৃতীয় দিন সকাল।

প্রফেসর রায় ও অ্যালেন মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে আসার পর ফড়িংয়ের মতো গঠন, একটা ছোট্ট হেলিকপ্‌টার ক্রেনে ঝুলিয়ে মহাকাশযান থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। এই হেলিকপ্‌টারের সাহায্যে অভিযাত্রীরা গ্রহের নানা অংশে ভ্রমণ করতে পারবে। হেলিকপ্‌টারে একটি কেবিন আছে। দরকার মতো তাতে বাস করা চলে।

প্রায় হাজার মাইল উড়ে গিয়ে নামল হেলিকপ্‌টার। সামনে এক হ্রদ। রায় সারা দিন ঘুরলেন হ্রদের ধারে ধারে। অ্যালেন কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে ঘুরেছিল। ছুতোনাতা করেও যেন রায়ের কাছে কাছে থাকতে চায়। যাক্ গে অ্যালেনকে নিয়ে তিনি বিশেষ মাথা ঘামান নি।

বিকেলে হতাশ রায় হেলিকপ্‌টারের কেবিনে ফিরলেন। অ্যালেন আগেই এসে পৌঁছেছে। সে বেশ ফুর্তিতে আছে। তার কাজ নাকি ভাল এগোচ্ছে। অ্যালেনের হাসি ঠাট্টায় মেজাজ খিঁচড়ে যাচ্ছিল। হয়তো অকারণেই তেতে উঠতেন। কোনো রকমে নিজেকে সংযত করে কিছু খেয়ে নিলেন রায়। শোওয়ার আগে একবার কেবিনের পোর্ট হোল দিয়ে বাইরে তাকালেন। পুরু স্বচ্ছ সার্সি ঢাকা জানালা। প্রক্সিমোর কোনো চাঁদ নেই। তাই প্রতি রাতেই এখানে অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকার। তবে অনন্ত মহাশূন্যে অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র ঝক্‌ঝক্ করে। আকাশের এক কোণে মেঘ জমেছে। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। রাতে বৃষ্টি হবে নাকি? রায় শুয়ে পড়লেন। অ্যালেন তখন বেতারে দিনের খবরাখবর পাঠাচ্ছে পাইলটকে।

অনেক রাতে রায়ের ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পোর্টহোল দিয়ে দেখলেন বাইরে। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। তবে ভয়ের কারণ নেই। মাটিতে দৃঢ়ভাবে আটকানো আছে হেলিকপ্‌টারের তিনটি ঠ্যাং। অ্যালেন একবার জেগে উঠে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে আবার ঝুপ করে শুয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে আকাশ দিব্যি পরিষ্কার।

হেলিকপ্‌টার উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হল প্রায় সাতশো মাইল দূরে। ওপর থেকে অ্যালেনের তীক্ষ্ণ চোখ আবিষ্কার করল কিছু যন্ত্রপাতির অবশেষ। অনেক বছর আগে এই গ্রহে যে সব যন্ত্র পাঠানো হয়েছিল নিশ্চয় সেইগুলি। হেলিকপ্‌টার নামলো সেখানে। প্রফেসার রায়ের ইচ্ছা ছিল আরও খানিক দূরে যায়। ওধারে কয়েকটা বড় বড় জলাশয় আছে। কিন্তু অ্যালেন জেদ ধরল, পুরনো যন্ত্রগুলোকে একবার পরীক্ষা করবে।

একা একা হেঁটে চলেছেন রায়। উঁচু নিচু এবড়ো খেবড়ো জমি। সাবধানে পা ফেলতে হয়। বহুদূরে এক সারি পাহাড়ের আবছা রেখা। সূর্যের তেজ এখনই বেশ কড়া। সামনে চড়াই। মসৃণ

পাথরের খাঁজে পা রেখে রেখে তিনি উঠতে লাগলেন। উঁচু জায়গাটার টঙে চড়ে দেখলেন চার ধার।

সামনে আধ মাইলের মধ্যে একটা সরু নালা। রায় খাড়াইয়ের উল্টো পিঠে নামতে শুরু করলেন।

আট দশ হাত চওড়া নালা। কিছুটা সোজা গিয়ে বেঁকে গেছে। পরিষ্কার টলটলে জল ভর্তি। হঠাৎ প্রফেসর রায়ের হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠল। তিনি জলের ধারে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। পাড়ের কাছে জট পাকানো সুতোর মতো কালচে সবুজ রঙের কি জানি ভাসছে। লাঠির ডগায় ওই বস্তু কিছু তুলে ধরলেন। শেওলা। ঘন চাপ চাপ তাজা উদ্ভিদ চকচক করে উঠল রৌদ্রের আভায়।

উঠে দাঁড়িয়ে রায় শেওলাগুলি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করছেন। কতক্ষণ মগ্ন হয়ে ছিলেন খেয়াল নেই। সহসা চমক ভাঙল এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে।

থরথর করে কেঁপে উঠল পায়ের তলার জমি। ভূমিকম্প! খালের জল হুস্ করে ভাসিয়ে দিল পাড়। বড় বড় পাথর গড়িয়ে পড়তে লাগল। রায় তাড়াতাড়ি ফিরে চললেন। খোলা জায়গায় যাওয়া দরকার। দু'ধারে উঁচু উঁচু শিলাস্তূপ। আবার এক প্রবল ঝাঁকুনি এবং তৎক্ষণাৎ পা হড়কে চিৎ হয়ে পড়ে গেলেন। এক খণ্ড তীক্ষ্ণ পাথরের ওপর আছড়ে পড়ল তাঁর দেহ। পিঠের কাছে আঘাত লাগল। নেহাৎ স্পেস-স্যুটের বর্ম বাঁচিয়ে দিল, নইলে ভীষণ আহত হতেন। তীব্র ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল শরীর। ফের টলতে টলতে উঠে দাঁড়াবার পর খেয়াল হল, বেতার যন্ত্রে অ্যালেনের ব্যাকুল কণ্ঠ বারবার ভেসে আসছে—'প্রফেসর, আপনি কোথায়? সাড়া দিন প্লিজ।'

রায় উত্তর দিলেন।

অ্যালেন পৌঁছে দেখল প্রফেসর রায় কুঁজো হয়ে অতি কষ্টে পা পা করে এগোচ্ছেন। এই নালাটা থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে যেতে হবে। দৈহিক যাতনা ভুলে এই ভাবনাই রায়কে ঠেলে নিয়ে চলেছে। নতুবা অ্যালেনের চোখে পড়ে যেতে পারে তাঁর আবিষ্কার।

অ্যালেনের ঘাড়ে ভর দিয়ে ফিরলেন রায়। হেলিকপ্টারে কেবিনে ঢুকে অ্যালেন পরীক্ষা করল তাঁর কাঁধ। নাঃ, ভাঙেনি কোনো হাড়। ব্যথা কমানোর ওষুধ খেলেন রায়।

'এখন চুপচাপ রেস্ট নিন প্রফেসর।' বলল অ্যালেন। উরিব্বাস্, কি সাংঘাতিক ভূমিকম্প। ভাগ্যিস চলে নি বেশিক্ষণ। বুঝেছি। আগের যন্ত্রপাতিগুলো এই কারণেই ভেঙেচুরে গেছে। এ রকম কাণ্ড এখানে বোধ হয় প্রায়ই হয়।'

রায় বললেন, 'হ্যাঁ, প্রক্সিমো নবীন গ্রহ। এখানে অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিপর্যয় প্রায়ই হয় এবং আরও কিছুকাল হবে। পৃথিবীর শৈশবেও এমনি অবস্থা ছিল।'

অ্যালেন পাইলটের সঙ্গে তখুনি যোগাযোগ করল। পাইলট জানাল, ভূমিকম্পের রেশ টের পেয়েছি, তবে মহাকাশ-যানের ক্ষতি হয়নি। তোমরা চটপট কাজ শেষ করে ফেল। কেটে পড়তে হবে। বিপদ্জনক জায়গা।'

ঘণ্টা দুই পরে রায় আবার উঠে বসলেন।

অ্যালেন বেরিয়ে গেছে। তার যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে প্রান্তরের মাঝে। এই সুযোগ।

রায় স্পেসস্যুট পরলেন। কাঁধের ব্যথাটা চিনচিন করে উঠল। রায় কেবিন থেকে বেরলেন। তারপর হেলিকপ্টারের আড়ালে আড়ালে সন্তর্পণে উল্টো দিকে কিছুদূর গিয়ে পাথুরে ঢিবির পিছনে আত্মগোপন করে এগিয়ে চললেন সেই নালা লক্ষ্য করে। যার জলে বিকশিত হচ্ছে উদ্ভিদ জগতের প্রথম ধাপ।

॥ ৪ ॥

পর পর দুটি বোতল খুলে ভিতরকার বস্তু রায় পরম যত্নে ঢেলে দিলেন নালার জলে। বোতলে ছিল কিছু ক্ষুদ্র বহুকোষী জীব। রায় গোপনে এনেছিলেন তাদের। এই গ্রহের আবহাওয়ায় যাতে বাঁচতে পারে এমনভাবে অভ্যস্ত করেছিলেন এই জীবগুলিকে। বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ার মতো উচ্চারণ করলেন—'যাও, বেঁচে থাক। হোক বিবর্তন। এই নতুন পৃথিবীতে সৃষ্টি হোক এক নতুন প্রাণিজগৎ।'

'এখানে কি করছেন প্রফেসর?'

কানে অ্যালেনের কথা ভেসে আসতেই রায় ভীষণ চমকে ফিরে দেখলেন মাত্র পঞ্চাশ ষাট হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং অ্যালেন। সে কাছে এসে বলল, 'আপনি এত দূরে হেঁটে এসেছেন? কি অন্যায়! আমি কত খুঁজছি।'

রায় হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকেন।

অ্যালেন হঠাৎ রায়ের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল জলের ধারে। হেঁট হয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'একি, এযে শেওলা! এখানে শেওলা এল কি করে? আশ্চর্য!!'

বিব্রত রায় নিজেকে সামলে নিয়েছেন। যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই ঘটল। শুধু শেওলা নয়, তাঁর শেষ অপকর্মটিও বোধ হয় অ্যালেনের নজর এড়ায় নি। ধীর কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন, 'একদিন আমাদের পৃথিবীতে যেমনভাবে উদ্ভিদের জন্ম হয়েছিল প্রক্সিমোতেও হয়তো সেই একই উপায়ে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়েছে।'

'ওয়ানডারফুল।' অ্যালেন উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'যাক, এবার ফিরুন প্রফেসর। পরে রিসার্চের ঢের সময় পাবেন। আপাতত আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।'

নীরবে কেবিনে ফিরলেন রায়। স্পেস স্যুট খুলে শুয়ে পড়লেন। কাঁধ টনটন করছে। মনে গভীর অবসাদ। পরিস্থিতিটা তিনি দ্রুত চিন্তা করতে থাকেন।

'আচ্ছা প্রফেসর, এখানে উদ্ভিদ তো পাওয়া গেল কিন্তু কোনো প্রাণীর চিহ্ন পেয়েছেন কি?'

অ্যালেনের প্রশ্ন শুনে রায় চোখ মেললেন। সে উৎসুক ভাবে সামনে বসে।

'না।' সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'জীব-জন্তু সৃষ্টি কি এখানে হবে কোনদিন?'

'হতে পারে।'

'যদি না হয়? কিংবা হয়তো আরও অনেক অনেক কাল দেরী করে হবে।'

রায় উত্তর দেন না।

'আচ্ছা, মানুষ তো ইচ্ছে করলে পৃথিবী থেকে প্রক্সিমোয় এমন কিছু প্রাণীর আমদানি করতে পারে যারা এখানে খাপ খাইয়ে নেবে, টিকে থাকবে। যেমন খুব নিম্নস্তরের জীব। কবে এখানে দৈবাৎ জীব সৃষ্টি হবে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকার দরকার কি? আপনি কি বলেন প্রফেসর?'

রায়ের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। ছেলেটা সমস্ত লক্ষ্য করেছে! ও তামাশা করছে তাঁর সঙ্গে!! লেজে খেলিয়ে মজা দেখছে। কি আস্পর্ধা! একটা দুর্জয় রাগ ছড়িয়ে পড়ে তাঁর শিরা উপশিরায়। মনে মনে এক ভয়ংকর সংকল্প দানা বাঁধতে থাকে। চিবিয়ে চিবিয়ে জবাব দিলেন—'কেন পারবে না। নিশ্চয় পারে। কোনো দরকার নেই অপেক্ষা করার।'

'আচ্ছা পৃথিবীর মানুষের বয়ে আনা জীব থেকে বিবর্তনের ফলে এই গ্রহে আবার একদিন বিদঘুটে ডাইনোসরদের আবির্ভাব হবে নাকি?' অ্যালেনের কণ্ঠে কৌতুকের ছোঁয়া।

রায় বললেন, 'জানি না। খুব সম্ভব পৃথিবীর প্রাণীদের সঙ্গে প্রক্সিমোর প্রাণিজগতের চেহারায় মিল থাকবে না। কারণ দুটোর প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক আলাদা।'

অ্যালেন একটু মাথা চুলকোয়। একটু ইতস্তত করে। তারপর বলে 'তবে কি জানেন প্রফেসর, এই গ্রহে মানুষের হাত দিয়ে নতুন প্রাণিজগতের বীজ বপন করা হয়তো উচিত হবে না।'

'কেন?' রায় প্রস্তুত হলেন। মহা ধুরন্ধর ছোকরা, প্রচুর ইনিয়ে বিনিয়ে এইবার আসল বক্তব্যে পৌঁছেছে॥

অ্যালেন বলল, 'আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রেসিডেন্টের তো তাই মত। তাঁর ভয়, বিবর্তনের ফলে এখানে সৃষ্ট জীব-জন্তু গাছ-পালা যদি মানুষের পক্ষে বিপদজনক হয়? তাহলে ভবিষ্যতে মানুষের এখানে বাস করতে অসুবিধা হবে। তিনি বলেন, প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে প্রক্সিমোর আবহমণ্ডলকে আধুনিক পৃথিবীর আবহমণ্ডলের কাছাকাছি তৈরি করে নিতে হবে। অবশ্য তার জন্য কিছুটা সময় চাই। অতঃপর পৃথিবী থেকে এখানে বাস করতে আসবে মানুষ এবং অন্যান্য উন্নত ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ।'

ধৈর্য হারিয়ে গর্জে উঠলেন রায়, 'তোমাদের প্রেসিডেন্ট একটি মহামূর্খ। তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে কিছুতেই এই সহজ সত্যটি ঢোকে না যে, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির প্রয়োজনে এবং পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্যই এই গ্রহে নতুন প্রাণী এবং উদ্ভিদজগৎ গড়ে তোলা উচিত। হ্যাঁ, যত শীঘ্র সম্ভব।'

'কেন?'

'ভেবে দেখ অ্যালেন, গত বিংশ শতাব্দীতে আমাদের পৃথিবীতে দু'দুবার মহাযুদ্ধ হয়েছিল। তারপর প্রায় দুশো বছর কেটে গেছে। নতুন মহাযুদ্ধ আর হয়নি বটে কিন্তু অন্ততঃ সাত আট বার মহাযুদ্ধ

লাগতে লাগতে কোনো রকমে ঠেকানো গেছে। যদি আবার মহাযুদ্ধ লাগে, তার পরিণতি কি হবে আন্দাজ করতে পার?'

'ধ্বংস,' 'অ্যালেন উত্তর দিল।

'হুঁ, সমূলধ্বংস। পারমাণবিক অস্ত্রের নির্বিচার ব্যবহারে প্রায় সমস্ত জীবজন্তু লোপ পাবে পৃথিবীর বুক থেকে।'

অ্যালেন মৃদু হেসে বলল, প্রেসিডেন্ট কিন্তু বলেন মহাযুদ্ধের ভয় আর নাই। মানব জাতির এখন চৈতন্য হয়েছে। এমন বোকামি তারা করবে না। তাঁর ভাবনা, অন্য কি কি গ্রহে মানুষের কলোনি বানানো যায়। পৃথিবীতে মানুষের আর জায়গা কুলচ্ছে না।'

'হুঃ', রায়ের ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি ফোটে।—'মানুষের চৈতন্য হয়েছে বুঝি? কৈ, লক্ষণ তো দেখি না। তা বেশ, যদি ধরে নিই তোমাদের প্রেসিডেন্টের ধারণা ঠিক, তা সত্ত্বেও এই গ্রহে এখন থেকেই প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ রচনা করতে আপত্তির কি? ভবিষ্যতে মানুষ যখন এখানে বাস করতে আসবে, এখানে তৈরি উদ্ভিদ ও প্রাণীরা তাদের উপকারেই লাগবে। তাদের খাদ্য জোগাবে। উদ্ভিদ বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ বাড়াবে। আমাদের নিজেদের পৃথিবীতে সব প্রাণী কি মানুষের বন্ধু? অনেক শত্রুও আছে। তাদের সঙ্গে মিলেমিশে আছি। এখানেও তাই করব 'খন। আর সবচেয়ে বড় কথা কি জান?'

—'কি?'

'মানুষের একটা আশ্রয় তৈরী হবে। প্রেসিডেন্টের মর্জি মাফিক প্রক্সিমোয় মানুষের বসতি স্থাপনের প্ল্যান যদি কোন কারণে ভেস্তে যায় তবু পৃথিবীর দুর্যোগে মানুষ এখানে পালিয়ে আসতে পারবে।'

'পারবে পালাতে?' বলল অ্যালেন।

'না পারলে মরবে সবাই। তারপর শুধু এক মুমূর্ষু গ্রহ যথানিয়মে পাক খেয়ে চলবে তার সূর্যকে ঘিরে যুগ যুগান্তর ধরে। কিন্তু তখন হয়তো এই প্রক্সিমোয় নতুন প্রাণীর জন্ম হতে থাকবে। লক্ষ কোটি বছর পরে কোনো দিন এখানে মানুষের মতো বা তার চেয়েও বুদ্ধিমান প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারে। মোটকথা পৃথিবীতে না থাক প্রতিবেশী নক্ষত্রলোকে অন্য এক গ্রহে তখন প্রাণীর অস্তিত্ব বজায় থাকবে এইটুকুই কি কম সান্ত্বনা?'

—'আশ্চর্য!'

'কেন, কথাগুলো পছন্দ হচ্ছেনা?' রায়ের সুরে ব্যঙ্গ।

'না, মানে ঠিক একরকম যুক্তি শুনেছি আর একজনের মুখে, ভারি মিল।'

রায় চট করে গুটিয়ে নিলেন নিজেকে। আহাম্মুকের মতো একগাদা কথা বলে ফেলেছেন। ধূর্ত ছেলেটা উসকে দিয়ে প্যাঁচ কষে তাঁর পেটের কথা বের করে নিয়েছে। ব্যাস, আর নয়।

রায় চোখ বুজে ঘুমোবার ভান করলেন।

॥ ৫ ॥

সত্যি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রায়। চোখ মেলে ঘড়ি দেখলেন, প্রায় চল্লিশ মিনিট কেটেছে। কেবিনে অ্যালেন নেই। বাইরে উঁকি দিলেন, প্রান্তরে তাকে দেখতে পেলেন না। ও নিশ্চয় সেই নালা দেখতে গেছে। চকিতে উদয় হল মনে নালার ধারে পড়ে আছে বোতল দুটো, তাঁর অপরাধের প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

রায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত। হৃদয়ে চিন্তার ঝড়।

অ্যালেন বড় বেশি জেনে ফেলেছে। আর ওকে জীবিত অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরতে দেওয়া চলে না। মহাকাশযানেও নয়। এমন কি আজ রাতে ওকে পাইলটের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করতে দেওয়া যায় না। দিনে তারা কয়েকবার পাইলটের সঙ্গে কুশলবার্তা বিনিময় করে। কিন্তু রাতে অ্যালেন তার সঙ্গে অনেক গল্প জোড়ে। তখন যদি এই আবিষ্কারের কাহিনী ফাঁস করে দেয়? জানা-জানি হলে প্রেসিডেন্ট প্রক্সিমোর জলে অঙ্কুরিত এই প্রাণী ও উদ্ভিদদের নির্মূল করার ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া আইন ভঙ্গের অপরাধে রায়ের বরাতে দণ্ডভোগ তো আছেই। সুতরাং অ্যালেন মরবে এবং সে নিজেই এর জন্য দায়ী।

উপায়টা সোজা। একটু বাদে কেবিনে ফিরে অ্যালেন খানিক বিশ্রাম নেবে বা ঘুমবে। সেই ফাঁকে তার স্পেস স্যুটের কলকব্জায় সামান্য কারসাজি করে রাখবেন রায়। ফলে অ্যালেন আবার বাইরে যাবার ঘণ্টাখানেকের ভিতরে সিলিণ্ডার লিক্ করে হঠাৎ তার প্রশ্বাসের অক্সিজেনভাণ্ডার যাবে ফুরিয়ে। ইতিমধ্যে হেলিকপটার নিয়ে তিনি সরে পড়বেন অনেক তফাতে। এরপর বিপন্ন অ্যালেনের কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার কাছে পৌঁছতে রায়ের কিঞ্চিৎ দেরি হয়ে যাবে। মানে ইচ্ছাকৃত ভাবেই দেরি করবেন তিনি। এবং তার আগেই অ্যালেনের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়বে প্রক্সিমোর ধূসর প্রান্তরে।

অ্যালেনের জন্য বেদনা বোধ করেন রায়। অমন তাজা সুন্দর একটি যৌবন অকালে ঝরে যাবে কোন সুদূর বিদেশে। কিন্তু উপায় কি? সমগ্র মানবজাতির স্বার্থে একটি জীবনকে বিসর্জন দেওয়া তো তুচ্ছ ব্যাপার। অহেতুক কৌতূহলই ছেলেটার বিপদ ডেকে এনেছে! অবশ্য সন্দেহ হয়, নিছক কৌতূহল কি? হয়তো অ্যালেন মহাকাশ-গবেষণা-সংস্থার প্রেসিডেন্টের চর। তাঁর নির্দেশে সে রঞ্জন রায়ের গতিবিধির ওপর বরাবর নজর রাখছে। এই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে রায়ের কয়েকবার খিটিমিটি বেধেছে। বৈজ্ঞানিক হিসাবে রায়কে খাতির করলেও প্রেসিডেন্ট রঞ্জন রায়কে তেমন পছন্দ করেন না। কিছুটা সন্দিগ্ধও।

নির্মম চিত্তে অ্যালেনের মৃত্যুদণ্ড জারি করলেও রায় ক্রমশঃ যেন দ্বিধা বোধ করেন। অ্যালেনের

প্রফুল্ল সুন্দর মুখখানা বারবার ভেসে ওঠে মনে। অস্থির হয়ে ওঠেন—নাঃ, এটা থাক। দ্বিতীয় পন্থাটাই নেওয়া যাক। সেই ভাল। আত্মরক্ষার সব রকম ব্যবস্থাতে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন তিনি।

রায় একটা বাক্স খুললেন। খানিক খুটখাট করে ফের শুয়ে পড়লেন। অল্পক্ষণের মধ্যে কেবিনের দরজা খুলে প্রবেশ করল অ্যালেন।

'কোথায় গিয়েছিলে? রায় প্রশ্ন করলেন।

'এই একটু ঘুরে এলাম'। পোশাক খুলতে খুলতে অ্যালেন জবাব দেয়। তার চোখেমুখে উত্তেজনার আভাস।

রায় উঠে দুটো গ্লাস এবং অরেঞ্জ-জুস-এর বোতলটা বের করে অ্যালেনকে বললেন—'ঠাণ্ডা সরবৎ খাবে নাকি?"

"খাব! আপনি কেন, আমিই বানিয়ে নিচ্ছি।"

রায় বললেন, তুমি বস, ক্লান্ত হয়ে এসেছ। আমি বানাই।'

গ্লাসে জল ঢেলে অরেঞ্জ-জুস্ মেশালেন রায়। এক ফাঁকে লুকিয়ে একটা গ্লাসে টুক করে একটি ছোট্ট বড়ি ফেলে দিয়ে চামচ দিয়ে সরবৎ নাড়তে নাড়তে নিরুত্তাপ স্বরে রায় বললেন, 'অ্যালেন মহামান্য প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে আমি মত প্রকাশ করেছি। মহাকাশযাত্রীদের পক্ষে এটা বিশ্বাসঘাতকতা। হয়তো আমার আরও গুরুতর অপরাধের প্রমাণ তোমার হাতে আছে। তুমি কর্তব্যের খাতিরে পৃথিবীতে ফিরে আমার বিরুদ্ধে নিশ্চয় রিপোর্ট করবে, কি বল?'

'উঁহু" অ্যালেন মাথা নাড়ে।

'কারণ?'

'কারণ, তাহলে আপনাকে যে শাস্তি পেতে হবে, আমাকেও সেই শাস্তি পেতে হব।'

রায় থ হয়ে যান। 'মানে?'

'মানে, খাণিকক্ষণ আগে আমি নিজে হাতে ওই শেওলা ভরা নালার জলে মিশিয়ে দিয়েছি কিছু প্রাণী। কিছু ক্ষুদ্র জীব।'

'সেকি? তুমি!' রায় যেন রহস্যের থৈ পান না।

'হ্যাঁ, আমিই। তবে আইডিয়াটা আমার নিজের নয়। আমি বাহক মাত্র। আর একজনের ইচ্ছাকে আমি বাস্তব রূপ দিলাম।'

'কার ইচ্ছে? কে তিনি?

বৈজ্ঞানিক এরিক মেলভিচ।'

—'তুমি, তুমি ডঃ এরিক মেলভিচকে চিনতে?'

'চিনি বৈকি', বলল অ্যালেন। 'তিনি ছিলেন আমার বাবার বন্ধু।'

'ডঃ মেলভিচ কি করতে বলেছিলেন তোমায়?'

অ্যালেন বলল, 'বছর খানেক আগে আমি প্রক্সিমো একস্‌পিডিসন্-এর জন্য নির্বাচিত হই। ডঃ মেলভিচ তক্ষুণি আমায় ডেকে পাঠান। ভিয়েনায় তাঁর বাড়ি গিয়ে আমি দেখা করি। তিনি তখন অসুস্থ, মরণাপন্ন।'

'জানি,' বললেন রায়। ল্যাবরেটরিতে প্রাণীদেহের ওপর তেজস্ক্রিয়-রশ্মির প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি নিজেই ওই মারাত্মক রশ্মির শিকার হন। হ্যাঁ—তারপর?'

অ্যালেন বলে, 'মেলভিচ আমায় অনুরোধ করেন যে, যদি আমি প্রক্সিমোর কোনো জলাশয়ে উদ্ভিদ আবিষ্কার করি তবে গোপনে সেই জলে তাঁর পালিত কিছু ক্ষুদ্রপ্রাণী যেন ছেড়ে দিয়ে আসি। আর উদ্ভিদের সন্ধান না পেলে প্রক্সিমোর জলে ছেড়ে দিই কিছু শেওলা ও আগাছা। ওই প্রাণী ও উদ্ভিদ তিনি আমার হাতে তুলে দেন। তার এক সপ্তাহের মধ্যে মেলভিচ ইহলোক ত্যাগ করেন। আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেছি। সেই হতভাগ্য বৈজ্ঞানিক আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। আমি জানি, তিনি কখনো মানুষের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল চিন্তা করেন নি। কৈ দিন সরবৎ, গলা শুকিয়ে গেছে।' অ্যালেন হাত বাড়ায়।

'এই যাঃ।' অ্যালেন চেঁচিয়ে উঠল।

অ্যালেনকে দিতে গিয়ে 'সরবতের গ্লাসটা রায়ের হাত ফসকে মেঝেতে পড়ে উলটে গেল। সমস্ত সরবৎ গেল গড়িয়ে। রায় কিন্তু একটুও ব্যস্ত না হয়ে নতুন এক গ্লাস সরবৎ তৈরি করে হেসে অ্যালেনের হাতে দিলেন।

আঃ—একটা গভীর তৃপ্তির নিশ্বাস রায়ের বুক ঠেলে বেরিয়ে আসে।

ছি ছি, উত্তেজনার বশে আমি কি ভুল করতে যাচ্ছিলাম!'

রায় তৈরি ছিলেন। অ্যালেন ফিরে এলে তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করে ফেলতেন। তারপর এক ধরনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ নিক্ষেপ করতেন তার মস্তিষ্কের স্মৃতি কোষে। ফলে অ্যালেন জেগে উঠলে, ওর মন থেকে মুছে যেত গত কুড়ি পঁচিশ দিনের সব ঘটনার স্মৃতি। সুতরাং শেওলা আবিষ্কারের কথা কেউ আর জানতে পারত না। পৃথিবীতে ফিরে রায় কৈফিয়ত দিতেন যে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগে অ্যালেনের এই অবস্থা হয়েছে।

তবে বিপদ হচ্ছে, এর ফল ঢের খারাপও হতে পারে। শরীর ও মস্তিষ্কের নানা খুঁটিনাটি পরীক্ষা না করে এই রশ্মির প্রয়োগে মগজ ভীষণভাবে জখম হবার সম্ভাবনা। অথচ অত সময় বা সুযোগ নেই। অতএব অ্যালেন প্রাণে বাঁচতো ঠিকই কিন্তু হয়তো লুপ্তবুদ্ধি জড়ভরত হয়ে তাকে কাটাতে হতো বাকী জীবনটা। উঃ, আর একটু হলেই এক মহৎ প্রাণ যুবকের সর্বনাশ করে ফেলতাম। ভাগ্যিস শেষ মুহূর্তে মনে হল, একবার বাজিয়ে দেখা যাক, ওর মতলবখানা কি।

'প্রফেসর রায়' অ্যালেন ডাকল, 'আপনি কি জানতেন, এই গ্রহে উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'কি করে।'

'কারণ এখানে গোপনে উদ্ভিদ যিনি পাঠিয়েছিলেন, আমি ছিলাম তাঁর বিশ্বস্ত সহকারী।'

'কে তিনি।'

'তাঁর নাম বৈজ্ঞানিক এরিক মেলভিচ।'

'এ্যাঁ। অ্যালেনের চক্ষুযুগল বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়।

রায় বললেন, 'তুমি জান, তেরো বছর আগে একটি স্বয়ংক্রিয় রকেটে করে কিছু যন্ত্রপাতি প্রক্সিমোয় নামিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ডঃ মেলভিচ ছিলেন তাদের প্রধান। তিনি চুপি-চুপি কিছু উদ্ভিদ, মানে শেওলা পাঠিয়ে দেন এখানে। এমন কৌশল করেন যাতে শেওলাগুলি গ্রহের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আমি তাঁকে এই কাজে সাহায্য করি।

'শুধু শেওলা কেন?' অ্যালেন জানতে চায়।

'উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে যাবে প্রাণীর খাদ্য অর্থাৎ উদ্ভিদ। তারপর যাবে স্বয়ং প্রাণী। বিবর্তনের ধারায় প্রাণী ও উদ্ভিদ জল থেকে ক্রমে ডাঙ্গার ছড়িয়ে পড়বে।'

'যাক বাঁচলাম।' অ্যালেন হাঁপ ছাড়ে। 'আমি তো ভেবে পাচ্ছিলাম না, কোথায় খুঁজি শেওলা। আর ঘাবড়াচ্ছিলাম, মেলভিচের আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে যদি আপনার চোখে পড়ে যাই। তা আপনিও যে'—সে এক গাল হাসল।

'প্রফেসর একটি প্রশ্ন। পৃথিবীতে ফিরে এই উদ্ভিদ আবিষ্কারের কথা আপনি কি জানিয়ে দেবেন?' অ্যালেন জিজ্ঞাসা করল।

'এ বিষয়ে মেলভিচ তোমায় কি পরামর্শ দিয়েছিলেন? ধর, তুমি যদি শেওলা আবিষ্কার করতে এবং আমি তা না জানতে পেতাম, কি করতে তবে?'

মিচকে হেসে অ্যালেন জানাল, 'ডঃ মেলভিচের পরামর্শ ছিল সে ক্ষেত্রে আবিষ্কারের খবর স্রেফ চেপে যেতে।'

রায় খুশি হয়ে বললেন, 'উত্তম, আমরা মেলভিচের উপদেশই মেনে নেব।'

প্রফেসর রায় ধীরে ধীরে বাংকে গা এলিয়ে দিলেন। শ্রান্ত কণ্ঠে বললেন, 'ভাই অ্যালেন, আমি একটু বিশ্রাম চাই। তুমি একটা কাজ কর। ওই নালা থেকে শেওলা যোগাড় করে প্রক্সিমোর হ্রদ, সমুদ্র, নদী, জলাশয়ে যত পার ছড়িয়ে দাও। এই অনুর্বর রুক্ষ গ্রহ তাড়াতাড়ি সবুজ হয়ে উঠুক। ডঃ মেলভিচের স্বপ্ন সার্থক হোক। কি, পারবে তো?'

'পারব। আপনি নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিন প্রফেসর।' অ্যালেন দৃঢ় স্বরে উত্তর দিল।

লীর দোকানে ঢুকে মঙ এক কোণে দাঁড়াল। আর একজন খদ্দের ছিল। ছোকরা কর্মচারীটি তাকে জিনিস দিয়ে বিদায় করে মঙের দিকে ফিরল।—'কি চাই?'

'চাল'।

ছোকরাটি চাল দেওয়ার বদলে মঙকে একবার তির্যক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে সোজা মালিক লীর কাছে হাজির হল। লী টেবিলে খাতার ওপর হিসেব করছিল। কর্মচারিটি তাকে কি জানি বলতে মুখ তুলে মঙকে দেখল। তারপর হেঁড়ে গলায় হেঁকে উঠল—'কি ব্যাপার মঙ? আবার কি চাই। পয়সা আছে?'

মঙ কাঁচুমাচু ভাবে বলল, 'না পয়সা আনি নি। লিখে রাখ। পরে সব শোধ করে দেব।'

'—উঁহু, আর ধার হবে না। এক সপ্তাহ ধারে ধারে চলছে। তোমার মতো খদ্দেরের সঙ্গে

বেশিদিন কারবার করলে বাপু আমার ব্যবসা লাটে উঠবে। ব্যবসা করতে এসেছি আমি। দানছত্র তো খুলিনি। নেহাৎ পুরনো খদ্দের বলে এদ্দিন চুপ করে ছিলাম।'

মণ্ড অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকল। আস্তে আস্তে বলল—'তোমার ধার আমি কবে শোধ করিনি, লী?'

'হুঁ—তা করেছ। তবে এবার আর আশা দেখছি না।' লী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গোদা গোদা হাত দুটো টেবিলের উপর রেখে বেলুনের মত ফুলো মুখটা সামনে বাড়িয়ে খুব মিহি সুরে বললে, 'বুঝলে বুড়ো, একটা ভাল পরামর্শ দিচ্ছি শোন। কেন মিছামিছি সময় নষ্ট করছ? তোমার বরাতে আর পাথর টাথর নেই। তাই বলি এবার দেশে ফিরে যাও। কাজকম্ম কর। বুনো হাঁসের পিছনে ছুটে নিজে মরছ। অন্যদেরও জ্বালাচ্ছ। গত দু'বছর ধরে তো দেখছি। হ্যাঁ, যাবার আগে আমার ধার-টার গুলো শোধ করে যেও কিন্তু।'

মণ্ড কোন উত্তর না দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল। লীয়ের তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তাকে যেন ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। ক্ষোভে দুঃখে সে দিশেহারা বোধ করছিল। বয়স ও দারিদ্র্যে জীর্ণ তার শরীর ধনুকের মতো নুইয়ে পড়েছিল। তার শীর্ণ তোবড়ানো মুখে অজস্র ভাঁজ। এলোমেলো ভাবে পা ফেলে মণ্ড ভাবতে ভাবতে পথ চলল।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে সে প্রথম এই অঞ্চলে এসেছিল। এই রত্নের দেশে। সত্যি, এমন দুরবস্থা তার কখনও হয় নি। খারাপ সময় আগেও অনেকবার এসেছে। কয়েকমাস যাবৎ কিছু পায়নি। কিন্তু তারপর আবার সৌভাগ্যের মুখ দেখেছে। কয়েকটি দামী পাথর পেয়ে গেছে। কিন্তু এবার যেন ভাগ্যদেবী আর মুখ তুলে চাইছেনই না। গত দু'বছরে যে কটা পাথর পেয়েছে তা অতি খেলো। বিক্রি করে কয়েকমাসের রসদ কেনার পয়সাও জোটেনি। মাঝে মাঝে পাথর খোঁজা বন্ধ করতে হয়েছে। এই গ্রামের কাছাকাছি কোথাও গিয়ে গায়ে গতরে খেটে তিল তিল করে পয়সা জমিয়ে, আবার ফিরে এসে কাজে নেমেছে। কিন্তু প্রত্যেক বারই পয়সা শেষ হয়ে গেছে। ভাগ্য ফেরে নি। ফের অভাব দেখা দিয়েছে। ধার জমেছে।

শুধু লী কেন? কিছুদিন হল অনেকেই তাকে দেখলে ঠাট্টা করছে। গায়ে পড়ে উপদেশ দিচ্ছে। 'যাও হে বুড়ো, এবার ফিরে যাও। কোনদিন রাস্তায় পড়ে বেঘোরে মরবে। খালি পেটে পাথর ভাঙ্গা কি এই বয়েসে পোষায়!'

গ্রামের প্রায় সীমানায় কোম্পানির আমলে তৈরি ভাঙ্গাচোরা দোতালা পাকা বাড়িটায় ভূতুড়ে নিস্তব্ধতা। কোম্পানির বাড়িটা ছাড়িয়ে কিছু দূরে মণ্ডের ছোট্ট কুটির। একটি মাত্র ঘর। বাঁশের দেয়ালের ওপর খড় ছাওয়া। মণ্ডের মতো তার বাসস্থানটিরও চরম দুরবস্থা। এবার বর্ষা বুঝি কাটেনা।

কুটিরের সামনে বেদির মতো পাথরটায় বসে পড়ল মণ্ড। ক্লান্ত পা দুটোকে ছড়াল। পরনের

প্যান্টটার সর্বাঙ্গে তালি মারা। সার্টটা ঘাড়ের কাছে ফেঁসে গেছে। দুটোই চিরকুটে ময়লা। এক টুকরো সাবান পেলে কেচে পরিষ্কার করে নেওয়া যেত। কিন্তু সাবান কেনার পয়সা কৈ ? পেটের ভাত জোটে না তো সাবান !

হ্যাঁ, লোকেরা ঠিকই বলে, তাকে নেশায় ধরেছে। রত্নের নেশা। চল্লিশ বছর আগে যখন বর্মা-রুবি মাইনস্‌-এ কাজ করতে আসে তখন কি মঙ জানত উত্তর বর্মার মগোক প্রদেশে এই বন-জঙ্গল পাহাড় রাজ্যে ঘুরে ঘুরে তার বাকি জীবনটা কেটে যাবে! তার দেশ এখান থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে। সেখানে তার নিজের বাড়ি আছে। বাড়ি যেত বছরে অন্ততঃ একবার। এখন পাঁচ বছর যায় নি। খালি হাতে ফিরতে তার লজ্জা করে।

পাথরের রহস্য জানতে তার কম দিন লাগে নি, একটু একটু করে জেনেছে। ক্রমে নেশা ধরেছে। বর্মা-রুবি মাইনস্‌-এ কাজ করার সময় সে প্রথম পাথর চিনতে শুরু করে। জানে, এই দেশের মাটির তলায় আছে মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার। নানান জাতের মূল্যবান কোরাণ্ডাম পাথর। চুনি, নীলা, চন্দ্রকান্তমণি। মাটি খুঁড়ে পাথর ভেঙ্গে বের কর। আর চিনতে শেখ পাথরের জাত। কোনটা দামী কোনটা খেলো।

কোম্পানিতে সে ছিল মজুর। মাটি পাথর কাটার কাজ। রত্নপাথর ঘাঁটাঘাঁটির তেমন সুযোগ ছিল না। কিন্তু আর পাঁচজনের মতো সেও কাজের ফাঁকে কিছু কিছু করে পাথরের জাত বিচারের বিদ্যে রপ্ত করেছিল। বছর দশেক পরে কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেল। অনেক কর্মচারী কিন্তু গেল না। লাইসেনস্‌ নিয়ে নিজেরাই প্রসপেকটিং শুরু করে দিল। মঙও থেকে গেল। তখন থেকে তার ভাগ্যের ওঠা নামার ইতিহাসের শুরু।

মঙ মাথা নেড়ে বিড় বিড় করতে লাগল। 'পেয়েছি, অনেকবার পেয়েছি। রাখতে পারিনি টাকা।'

মঙ চিরকাল বেহিসেবী। উড়নচণ্ডী। যখনই দামী পাথর বেচে মোটা টাকা হাতে পেয়েছে দু'হাতে উড়িয়েছে। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে দেদার ফূর্তি করেছে। ব্যস্‌ দু'দিনে ফতুর, আবার যে কে সেই পাথর ফাটান। প্রাণান্ত পরিশ্রম করা।

উদাস চোখে গ্রামের ঘরবাড়ির দিকে চেয়ে মঙ ভাবতে লাগল। এক সময় কি জমজমাটই না ছিল এই গ্রাম। পুরনো দিনের সেই ছবি মঙের মনে ভাসে। বড় বড় বাড়ি। সুন্দর দোকানপাট। কত লোকজনের আনাগোনা। ইরাবতী নদীর কূলে ঘাটে সর্বদা নৌকোর ভিড়। লঞ্চও বাঁধা থাকত দু'একটা। বর্মা-রুবি মাইনস্‌-এর দিন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অনেককাল বাড়বাড়ন্ত ছিল এই গ্রাম। তারপর ক্রমে অবস্থা খারাপ হতে থাকল। কেবল এই গ্রাম নয়। এই অঞ্চলের আরও অনেক গ্রাম যারা রত্নপাথরের খনিগুলির দৌলতে ফেঁপে উঠেছিল সবারই ভাগ্যরবি যেন অস্ত গেল।

মাটির তলায় লুকোনো মণিমাণিক্যের ভাণ্ডার যেন ফুরিয়ে গেল। দামী পাথর আর তেমন

পাওয়া যায় না। খাটুনি পোষায় না। বেশির ভাগ অনুসন্ধানকারী চলে গেল। শুধু মণ্ডের মতো কয়েকজন মাটি কামড়ে পড়ে রইল। রক্তে যাদের নেশা লেগেছে। রত্নপাথর খোঁজার সর্বনাশা নেশা।

পুরনো লোক, মণ্ডের বন্ধু-বান্ধবেরা আজ কেউ নেই। তবে এখনও প্রতিবছর কিছু কিছু নতুন লোক আসে এ অঞ্চলে। কয়েক বছর খোঁজে। কেউ কিছু কিছু পায়। কেউ কিছুই পায় না। তারপর তারা চলে যায়। বেশিদিন থাকে না কেউ।

মণ্ড ভাবে, আর না। এবার ফিরে যাই। দেশে তার দু'মুঠো ভাতের অভাব হবে না। কিন্তু হতাশ মনে পরাজিত হয়ে ফিরতে তার আঁতে লাগে। যদি তেমনি কিছু পাই তো ফিরব, নইলে নয়।

মণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। রোদ বেশ চড়া হয়ে উঠেছে। পাথর তাতছে। ঘরে ঢুকে সে কৌটো, হাঁড়িকুড়িগুলো নেড়েচেড়ে দেখল চারমুঠো চাল অবশিষ্ট আছে আর এক ফালি কুমড়ো। অর্থাৎ মাত্র একবেলার আহার। থাক, এখন রান্না করব না, রাতে খাব। আসছে দিনের ভাবনা মণ্ডের মাথায় আসে না। যা হয় হবে। শুধু লী কেন, অন্য কোনো লোক তাকে আর ধার দেবে না। অনেকের কাছেই তার প্রচুর ধার জমেছে। শেষে ভরসা ছিল লী, তাও গেল। বাধ্য হয়ে আবার হয়তো তাকে মজুরি খাটতে হবে। কিন্তু বুড়ো বয়সে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আর শরীরে সয় না।

খাবার চিন্তায় লীর ঠাট্টা মনে পড়ল। তার কাছে কটা টাকাই বা ধার? অথচ মণ্ডের কৃপায় তার কম লাভ হয়নি এতদিনে। বোকা মণ্ডকে অনেকে ঠকিয়েছে। তার অংশীদাররা। দোকানদাররা। যখন সে পাথর ভাল চিনত না, দাম জানত না, অংশীদাররা প্রায়ই ভাল ভাল পাথরগুলো ঠকিয়ে নিয়েছে। ঐ লী কতবার দামী পাথর নামমাত্র দামে কিনেছে তার কাছ থেকে। আবার টাকা হাতে পেয়ে ঐ লীর দোকানেই সে ফূর্তি করেছে। জিনিস কিনেছে।

মাসের শেষে মোটা বিল দিয়েছে লী। একবার চোখ বুলিয়েও দেখেনি হিসেবটা। তৎক্ষণাৎ মিটিয়ে দিয়েছে সব পাওনাগণ্ডা। বন্ধুরা বলেছে ও বেটা জোচ্চোর। ঠকায়। মণ্ড কিন্তু কখনও লীকে কিছু বলেনি। আর আজ কি অপমানটা করল। এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই লোকটার।

মণ্ড উঠে দাঁড়াল। খনি খোঁড়ার দরকারী যন্ত্রপাতি ভরা থলিটা কাঁধে নিয়ে সে কুটিরের বাইরে বেরুল।

গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে মাইল খানেক দূরে পাহাড় জঙ্গলের শুরু। বনের কাছে এক গভীর গর্ত। খনির খাদান এখন ঝোপ ঝাড়ে ঢাকা। বড় বড় গাছ গজিয়েছে চারপাশে। প্রচুর রুবি ও নীলা পাওয়া গেছিল এই খাদে। মণ্ড বনের ভিতর ঢুকল। বনের মধ্যেও এমনি অনেক পরিত্যক্ত খনি ছড়িয়ে আছে। এক জায়গায় সে দেখল কয়েকজন লোক একটা খাদে কাজ করছে। এরা বছরখানেক হল খাদানটা খুঁড়ছে। কিছু কিছু পাথরও পেয়েছে। তবে রুবি কম, বেশির ভাগই নীলা।

এ-রকম দলবেঁধে কাজ করলে অনেক সুবিধে। কিন্তু মঙের দুর্ভাগ্য কেউ তাকে এখন অংশীদার নিতে চায় না। পয়সা নেই, বুড়ো। কাজেই মঙকে একা একাই কাজ করতে হয়।

তবে একা কাজ করার চেয়ে ইদানিং তাকে সবচেয়ে মুশকিলে ফেলেছে তার চোখ। তার দৃষ্টিশক্তি বেশ কমে গেছে। পাথর বাছতে অসুবিধা হয়। হয়তো বাজে পাথরের সঙ্গে দু'একটা ভাল দামী পাথরও ফেলে দেয়। কিন্তু শহরের ডাক্তারকে চোখ দেখানো বা চশমা নেবার ক্ষমতা তার নেই। তাই খুব ধীরে সাবধানে পাথর পরীক্ষা করে।

কাছে কোনো বড় পাহাড় নেই। নিচু পাহাড় বা টিলা। পাহাড়ের গায়ে ও উপত্যকায় নানা-রকম গাছ গাছড়া। লম্বা লম্বা সেগুন গাছ। ঘন বাঁশের ঝাড় আর কাঁটা ঝোপই বেশি। শক্ত মাটির তলায় চুনা পাথরের স্তর। কোথাও বা কালচে কঠিন গ্রানিটের টিপি।

মঙ একটা পুরনো খাদের পাশে থামল। কিছুদিন ধরে সে এই খাদানটার মধ্যে খুঁজছে। খাদানটা ভাল করে খোঁড়া হয়নি। যারা এখানে আগে কাজ করেছিল কোনো কারণে অনুসন্ধান শেষ না করেই চলে গেছিল। ঝোপ ও লতায় অনেকটা ঢেকে গেছে গর্ত।

খাদের দেয়ালের খাঁজে খাঁজে পা রেখে মঙ সাবধানে নিচে নামল। প্রায় তিরিশ ফুট গভীর খাদ। এক জায়গায় অনেকগুলো বড় বড় পাথরের চাঙড় ছড়ানো। এগুলো ভাঙতে হবে। ওপর থেকে এক ফালি রোদ এসে পড়ছে। তবে আলো বেশিক্ষণ থাকবে না। মঙ তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করে দিল।

খস্ খস্ করে একটা আওয়াজ হতেই মঙ সতর্ক হল। কিসের শব্দ? শেয়াল, বুনো কুকুর না সাপ? ক্ষীণ দৃষ্টি যথা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে ওপরে চাইল। চারপাশে দেখল। একটা ছোট পাথরের টুকরো হাতে তুলে নিল। দরকার হলে ছুঁড়বে।

নাঃ, শব্দটা থেমে গেছে। পাথরটা ফেলে দিতে গিয়ে সে চমকে উঠল। পাথরের গায়ে সন্তর্পণে আঙুল বোলাল। একটা ছোট্ট নুড়ি। পাথরের গায়ে আটকে রয়েছে। তার চোখ দুটি মাঝে মাঝে বিশ্বাসঘাতকতা করলেও তার অভিজ্ঞ আঙুলের স্পর্শ কখনও ভুল করে না। সাধারণ নুড়ি নয়, কেমন মসৃণ। নিশ্চয় দামী পাথর। তাড়াতাড়ি সে হাতুড়ি ঠুকে পাথর ভেঙ্গে নুড়িটা বের করল।

সুপুরির মতো ছোট্ট গোল নুড়ি। হুঁ, রঙটা যেন লালচে। একটু ঘষে পরিষ্কার করে সে ভাল করে দেখল। বাঃ, গাঢ় লাল রঙ যেন ফুটে বেরচ্ছে। রোদের আলোয় সে নুড়িটা পরীক্ষা করল। উত্তেজনায় ধক ধক করে উঠল তার হৃৎপিণ্ড। হ্যাঁ, যা ভেবেছে ঠিক। টুকটুকে লাল স্বচ্ছ পাথর। পায়রার রক্তের মত গাঢ় লাল রঙা চুনি। যাকে বলে পিজিয়ন ব্লাড রেড রুবি। পৃথিবীর সেরা মণি। হীরের চেয়েও দামী। অতি দুর্লভ বস্তু। মনে হচ্ছে পাথরটির ঘনত্বও নিখুঁত। এখন অবশ্য তেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না। কিন্তু মঙ জানে কেটে পালিস করলে এই পাথরের টুকরোটি অঙ্গারের মত জ্বলবে। আলো পড়লে ঝিলিক দেবে।

এই রক্তরঙা চুনি কেবল উত্তরবর্মার মগোক অঞ্চলে ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না। তাও আজকাল অতি দুষ্প্রাপ্য। সৌখিন ধনীর জগতে একটি পিজিয়ন ব্লাড রেড রুবির জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। অস্বাভাবিক দর ওঠে। ডান হাতের তেলোয় রাখা চুনিটি দেখতে দেখতে মঙের সারা শরীর কাঁপতে থাকে। দরদর করে ঘাম ঝরে। যেন বিশ্বাস হয় না ব্যাপারটা। বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে চুনিটা। না, কোনো ভুল নেই।

কত ওজন হবে? মঙ আন্দাজ করল প্রায় কুড়ি ক্যারেট। সময় নষ্ট না করে সে চুনি পকেটে পুরে যন্ত্রপাতি থলিতে ভরে গ্রামের পথে রওনা দিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলল।

মঙ সোজা বা-থিনের দোকানে এসে ঢুকল। লীর মত বা-থিনেরও হরেকরকম ব্যবসা। মশলাপাতি, মণিহারি জিনিস সাজানো রয়েছে দোকানে। সঙ্গে লাগোয়া একটি ঘরে পান ভোজনের ব্যবস্থাও আছে। তাছাড়া লীর মত বা-থিনও মণি রত্ন কেনাবেচা করে। গট্‌গট্‌ করে এসে বা-থিনের সামনে টেবিলের ওপর চুনিটি রেখে মঙ বলল—'ওজন কর।'

পাথরটি দেখে বা-থিন চমকে উঠল।

খপ্‌ করে তুলে নিয়ে আইগ্লাস বের করে চোখে লাগিয়ে গভীর মনোযোগে পরীক্ষা করল। উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠল। একটু ইতস্ততঃ করে সে যেন অভ্যাসবশেই বলতে যায়—উঁহু, তেমন ভাল জাতের বলে মনে হচ্ছে না তো। কমদামী মাল।'

কিন্তু মঙের ভাবলেশহীন মুখ দেখে সে নিজেকে সামলে নিল। মঙের মতো ঝানু পাথর খুঁজিয়েকে এসব ভাঁওতায় ভোলানো যায় না বাথিন জানত। বরং সে হাত বাড়িয়ে মঙের হাত চেপে ধরে বলল,—'অভিনন্দন মঙ। খুব ভাল জিনিস পেয়েছো। খাঁটি মাল।'

মঙ আবার নিস্পৃহ স্বরে বলে, 'ওজন কর।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ করছি।' বাথিন চটপট দাঁড়িপাল্লা বের করে।

হুঁ, যা ভেবেছিল ঠিক। 'একুশ ক্যারেট।'

'দাম কত?' মঙ একই সুরে বলল।

বাথিন কাগজ কলম বের করে নানারকম অঙ্ক কষতে লাগল। কিন্তু মঙ ততক্ষণে মনে মনে একটা হিসেব কষে ফেলেছে।

'পনের হাজার টাকা।' বাথিন বলল।

মঙ হাত বাড়াল। 'পাথর দাও।'

'সে কি।' বাথিন আঁৎকে ওঠে।—'ভাবছ বুঝি ঠকাচ্ছি। বেশ আরও দু'হাজার দিচ্ছি।'

'না। পাথর দাও। এখন বিক্রি করব না।'

'বেশ বেশ তাড়াহুড়োর কি আছে। পাথর দিচ্ছি। তা দু'দণ্ড বসতো। ওরে কে আছিস। দুটো মাংসের চপ নিয়ে আয়, আর চর্বির বড়া। গরম গরম আনবি।'

মঙ নির্বিকার ভাবে চা ও চপ খেল। তারপর চুনি পকেটে পুরে বেরিয়ে এল। বাথিন পিছন পিছন, আসে।—দেখ মঙ আমি তোমার কদ্দিনকার খদ্দের। কখনও ঠকিয়েছি তোমায়? জানি তুমি অন্য দোকানে যাবে দর যাচাই করতে। বেশ, অন্যরা যা বলে আমিও ঠিক তত দিতে রাজি। মনে রেখ কথাটা।'

লী হঠাৎ মাথা তুলে টেবিলের সামনে মঙকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল। প্রায় মুখ ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছিল—আবার কি? বললাম তো ধারটার হবে না।' কিন্তু মঙের হাবভাব দেখে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মঙ গম্ভীরভাবে চুনি বের করে টেবিলে রাখল —'ওজন কর। কত দাম হবে।'

পাক্কা জহুরী লী পাথরটি এক নজরে দেখেই চিনতে পারল। একটু পরীক্ষা করেই কোন সন্দেহ রইল না তার। উত্তেজনায় তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল—'এ্যা, আজই পেলে বুঝি এটা?'

—'হুঁ।'মঙের সংক্ষিপ্ত জবাব।

অনুশোচনায় লীর নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয়। ওঃ, এই লোকটাকে সে আজ সকালে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন? যদি মঙ প্রতিশোধ নেয়? যদি তাকে এই চুনি বিক্রি করতে না চায়? ইস্, বহুদিন এমন ভাল লাভের সুযোগ আসে নি তার ভাগ্যে। এই রক্তরঙা চুনি বিদেশী ধনীর কাছে বিক্রি করে মোটা দাঁও মারা যাবে।

লী তৎপর হয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছোকরা কর্মচারীটির উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়ল, —'এই ব্যাটা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ভদ্রলোককে বসার টুল দে। আর দেখ কি কি খাবার পাওয়া যায়। যা যা টাটকা পাবি আনবি।'

তারপর বলল, 'হেঁ হেঁ বুঝলে মঙ। তোমার সৌভাগ্য উপলক্ষ্যে একটু খাওয়া-দাওয়া না করলে কি চলে?' লী দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

মঙ প্লেটভর্তি খাবারের সদ্‌গতি করতে করতে বলল, 'কৈ, ওজন করলে না? দামটা হিসেব কর।'

'হ্যাঁ করছি। তাড়া কিসের! আগে খাও।'

'সতেরো হাজার টাকা।' দামটা বলে ফেলে লী আড় চোখে মঙকে লক্ষ্য করে। উঁহু, মনে হচ্ছে পছন্দ হয়নি দামটা। তাড়াতাড়ি বলল—'আচ্ছা, আঠারো হাজার দেব। কি, চলবে?'

মঙ মুখ মুছতে মুছতে হাত বাড়ায়—'আমার পাথর দাও।'

লী শশব্যস্ত হয়ে বলে, 'কি! পোষাল না? বেশ আর এক হাজার দিচ্ছি—উনিশ। এর বেশি কেউ দেবে না। তুমি যাচাই করতে পার। আরে! তোমায় কি আমি ঠকাব? আমাদের কি কেবল লাভ-লোকসানের সম্পর্ক। এ্যা? তুমিই বল?'

মঙ মাথা নাড়ল।—'পাথর দাও, এখন বেচব না।'

লী হতাশ ভাবে, বলল, 'বেশ, আর এক হাজার দিচ্ছি। এবার খুশি?'

মঙ কথা না বাড়িয়ে চুনি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

লী হাত কচলাতে কচলাতে রাস্তার মোড় অবধি সঙ্গে চলল। মনে করিয়ে দেয় তাদের কতদিনের বন্ধুত্ব। কতদিনের কারবার। 'হ্যাঁ, সকালের ব্যাপারটা-ভাই রাগ কর না। মাথার ঠিক ছিল না আমার। একটা মোটা লোকসানের খবর পেলাম আজ সকালেই। সর্বনাশ হয়ে গেছে ব্যবসার। নইলে কি ঐ সামান্য ক'টা টাকার জন্যে তোমায় তাগাদা দি? এদ্দিন তো দেখছো আমায়। তুমিই বল।'

মঙ উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল।

গ্রামের পথে যার সঙ্গে মঙের দেখা হয় সেই সেধে সেধে কথা বলে। যারা এতদিন, 'কি হে বুড়ো' ইত্যাদি ভাষায় তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলেছে, তারাই 'আজ্ঞে মশাই' বলে সম্বোধন করতে লাগল। মুখে তাদের সমীহ। প্রথমটা মঙ অবাক হয়ে গেলেও একটুক্ষণ পরে রহস্যটা ধরতে পারল।—অর্থাৎ খবরটা রটে গেছে।

মঙ তার কুটিরের ভিতর ঢুকে স্থির হয়ে বসল। হুম, এখন কি করা যায়? নাঃ ক্ষিদে নেই। লী ও বাথিনের কল্যাণে পেট ভর্তি। ঘুম পাচ্ছে। সারাদিনের খাটুনি ও উত্তেজনায় শরীর অবসাদে জড়িয়ে আসছে। কিন্তু এই নির্জন ভাঙ্গা ঘরে ঘুমনো কি ঠিক হবে? এখানে দুষ্টু লোকের অভাব নেই। সে বৃদ্ধ, দুর্বল। কেউ যদি জোর করে চুনিটা কেড়ে নেয় বা ঘুমের মধ্যে চুরি করে? এ চুনি সে এখানে বিক্রি করবে না। মান্দালয় সহরে নিয়ে যাবে। সেখানকার জহুরীদের সঙ্গে দরদস্তুর করলে তার দৃঢ় বিশ্বাস আরও কয়েক হাজার টাকা বেশি পাওয়া যাবে।

ভেবে চিন্তে মঙ কুটির ছেড়ে বেরিয়ে জঙ্গলের পথে হাঁটা দিল।

মঙ কোথায় আত্মগোপন করেছিল, কোথায় সে ঘুমিয়েছিল কেউ জানে না। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক পরে সে যখন গ্রামে আবির্ভূত হল তাকে দেখে সবাই হতভম্ব।

উস্‌কো খুসকো চেহারা। চোখ লাল। পাগলের মত চেঁচাচ্ছে এবং হাতে একটা মস্ত ধারালো কাটারি।

কি ব্যাপার! ব্যাপারটা অচিরেই জানা গেল। মঙ জঙ্গলের ভিতর ঘুমিয়েছিল। সেই সময় কেউ নাকি তার চুনি চুরি করেছে।

মঙ উন্মাদের মতো পথে পথে ছুটে বেড়াতে লাগল। যাকে দেখে ভয়ঙ্কর ভাবে কাটারি তুলে তেড়ে যায়।

—'বল, কে চুরি করেছে আমার পাথর? নিশ্চয় জান। বুঝেছি যড়যন্ত্র। বেশ, আমিও দেখে নেব কেমন সে আমার হকের ধন হজম করে। ঠিক খুঁজে বের করব সেই শয়তানকে। আমি তাকে খুন করব।'

গ্রামের লোক মণ্ডের সেই বিভীষণ মূর্তি দেখে যে যার ঘরে ঢুকে দোর দিল। চুনির শোকে বুড়োর মাথার ঠিক নেই। কি জানি কি করে বসে।

মণ্ডকে ছুটে আসতে দেখে লী ঝটপট দোকানের ঝাঁপ ফেলে ভিতরে বসে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। মণ্ড বাইরে থেকে তারস্বরে চেঁচাল, 'বুঝেছি, এ তোর কীর্তি লী। ভালয় ভালয় পাথর বের করে দে, নইলে এর শোধ আমি তুলব।'

লী কোনো সাড়াশব্দ দিল না।

সেখান থেকে মণ্ড ছুটল বাথিনের উদ্দেশে।

বাথিন অবশ্য আগে থেকেই খবর পেয়ে দোকান বন্ধ করে সরে পড়েছিল !

মণ্ড অনেকক্ষণ এইভাবে চেঁচামেচি ও আস্ফালন করে তার কুটিরে ফিরে গেল। তার চুনির কিন্তু কোনো হদিস মিলল না।

গ্রামে তো বেজায় হুলুস্থুল। কে চুরি করল মঙের চুনি ?

একদল বলল, 'এ নির্ঘাৎ বেঁটে চ্যাং-এর কীর্তি।' লোকটা দাগী চোর এবং অনেকে তাকে মঙের পিছন পিছন যেতে দেখেছে। আর এক দলের রায়, 'এটি ফুজির হাত সাফাই। বিকেল বেলা ও বনে ঢুকেছিল কি করতে !'

ফুজি ও চ্যাং দু'জনেই গুজব কানে যাওয়া মাত্র দৃঢ়ভাবে সব অভিযোগ অস্বীকার করল। তাছাড়া তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণও কিছু নেই। হাতে নাতে কেউ ধরেনি। মঙও বলতে পারছে না কে নিয়েছে।

লী ও বাথিনের মতো ব্যবসায়ীরা দারুণ ঘাবড়ে গেল। ছি ছি কি কাণ্ড! এরকম চুরি-চামারি হলে ব্যবসা চলে কি ভাবে ! যে চুরি করেছে, সে তো পাথরটা নিয়ে সটকাবে এবং অন্য কোথাও বেচবে। এতে এই পাথর কেনা বেচা করে তারা যে লাভটুকু করত সেটি মাঠে মারা গেল।

লী বেঁটে চ্যাং-এর এক সাকরেদকে পাকড়ে মিষ্টি মিষ্টি করে শোনাল।—'দেখ ভাই, কেউ যদি একখানা ভাল চুনি বিক্রি করতে চায়তো আমার কাছে পাঠিও! উচিত দাম দেব! হ্যাঁ, পাথর সে কোত্থেকে পেয়েছে! কেমন করে? এসব নিয়ে আমি বিন্দুমাত্র মাথাই ঘামাব না! আর কথা দিচ্ছি যেই বিক্রি করুক না কেন, তার নাম ধাম আমি গোপন রাখব।'

ইতিমধ্যে বাথিনও একই বার্তা প্রচার করেছিল।

মঙ সে রাতে কেমন করে কাটাল কেউ খোঁজ করেনি। খোঁজ করার সাহসও ছিল না কারও। যাহোক পরদিন সকালে তাঁকে দেখা গেল নদীর ঘাটে বসে আছে।

সেদিন মান্দালয়গামী স্টিমার আসার দিন। ইরাবতী নদীপথে যাত্রী ও মালপত্র নিয়ে স্টিমার আসা যাওয়া করে। তবে রোজ নয় কয়েকদিন অন্তর অন্তর। স্টিমার গ্রামের ঘাটে থামে। এখান থেকে তাড়াতাড়ি শহরে যাওয়ার বা আসার এই একমাত্র উপায়। নইলে নৌকোয় বা ডাঙ্গাপথে অনেক বেশি সময় লাগে।

স্টিমার এল। মঙ ছাড়াও ঘাটে আর কয়েকজন যাত্রী ছিল। সবাই উঠল। গ্রামের লোক কৌতূহলী হয়ে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল—'মঙ, কোথায় চললে ?'

অনেকক্ষণ পর মঙ চিৎকার করে উত্তর দিল—'থানায়।'

এখান থেকে ঘণ্টাখানেক স্টিমারে গেলে থানা। ঐ থানার দারোগার উপর এ অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার।

ডেকের এক কোণে মঙ কাঠের মতো খাড়া বসে রইল। তার তীব্র উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি জলের দিকে নিবদ্ধ। যাত্রী ও মাল্লারা ফিস-ফিসিয়ে তার দুর্ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। কেউ অবশ্য তার কাছে ঘেঁষল না। এমন কি তার কাছে স্টিমারের টিকিট অবধি চাইতে গেল না কেউ।

থানার ঘাটে স্টিমার ভিড়তেই মঙ লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় নামল। সারেংকে আদেশ দিল—'খবরদার, কাউকে নামতে দেবে না। আমি পুলিশ ডাকছি। তল্লাশী হবে।'

থানার দারোগা মঙের নালিশ শুনে বলল, 'তাইতো, খুবই দুঃখের ব্যাপার। তোমার এত বড় লোকসান হল। নাঃ, ঐ গ্রামের বদমাসগুলো বড় জ্বালাচ্ছে। একবার আচ্ছা করে কড়কে না দিলে দেখছি চলছে না। তবে এখন লঞ্চে তল্লাশী করে কিস্সু ফল হবে না। যে চুরি করেছে সে কি আর এই স্টিমারে চলেছে। মনে হয়, সে আপাতত গ্রামেই আছে। পরে সুযোগ বুঝে পালাবে। আমি বরং গ্রামে সেপাই পাঠাচ্ছি। কিন্তু চুনি ফিরে পাওয়ার আশা কম। কে নিয়েছে যখন দেখতে পাওনি।'

মঙ নাছোড়বান্দা।—নিশ্চয় ঐ গ্রাম থেকে যারা আসছে তাদের মধ্যে কেউ চুরি করেছে আমার চুনি। তাদেরই কারো কাছে আছে। তাড়াতাড়ি সহরে চলেছে বিক্রি করতে।'

অগত্যা বাধ্য হয়ে দারোগা উঠল। নইলে যে বুড়ো নড়বে না।

মঙের সঙ্গে আরও আটজন লোক ঐ গ্রামের ঘাট থেকে স্টিমারে উঠেছিল। তাদের জামা কাপড় জিনিসপত্র তন্নতন্ন করে খুঁজেও হারানো চুনির পাত্তা পাওয়া গেল না। বিরক্ত দারোগা সেপাইদের নিয়ে ফিরে গেল।

যাবার আগে দারোগা মঙকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করবে?' 'জানি না'—মঙ উত্তর দিল।

—'এই স্টিমারেই যাবে?

'—হ্যাঁ।'

থানার এক সিপাই ছুটি নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিল ঐ স্টিমারে। দারোগা তাকে ডেকে বলল। —"লোকটার ওপর একটু নজর রেখো হে। শেষে আত্মহত্যা না করে বসে। তাহলে আরও ভোগাবে আমায়।'

মঙ ডেকে কোণে গিয়ে বসেছে। তার মাথা সামনে ঝুঁকে পড়েছে। ডান হাতের তালু মুখের ওপর চাপা। সমস্ত ভঙ্গিতে চরম হতাশা ও রিক্ততার ভাব। মঙের অবস্থা দেখে অন্যদের দুঃখ হচ্ছিল। তবে তার গ্রামের সঙ্গী ক'জন বেজায় চটেছে। তারা দূর থেকে মুণ্ডপাত করছিল বুড়োর। মঙের অবশ্য কোন খেয়াল নেই। নিজের চিন্তায় ডুবে আছে।

মান্দালয়ে স্টিমার থামতে মঙ নামল। সিপাইটি দারোগার কথামতো কিছুক্ষণ মঙকে চোখে চোখে রেখেছিল। কিন্তু জাহাজ-ঘাটায় ভিড়ের মধ্যে হুস্ করে মঙ কোথায় যে হারিয়ে গেল। সিপাইটির তাড়া ছিল। একটা ক্ষ্যাপা বুড়োর পিছনে বাজে সময় নষ্ট না করে সে ছুটল শ্বশুরবাড়ি যাবার নৌকো ধরতে।

আরও দু'দিন পরে।

দুপুর বেলা এক নির্জন মাঠের ধারে মঙ বাস থেকে নামল। একজন লোক সেই বাসে উঠবে

বলে দাঁড়িয়েছিল। মণ্ডকে দেখে চেঁচিয়ে বলল—'আরে মণ্ড যে, অনেক কাল পর। থাকবে তো কিছুদিন?'

'হ্যাঁ ভাই, এবার দেশেই থাকব ঠিক করেছি। আর ফিরব না।' মণ্ড হাসিমুখে উত্তর দিল।

'বেশ বেশ। পরে দেখা হবে, গল্প হবে।' বলতে বলতে লোকটি চলন্ত বাসে উঠে পড়ল। মণ্ড একা একা দাঁড়িয়ে রইল।

দূরে মাঠের ওপারে গাছপালা ঘেরা তার নিজের গ্রামটির দিকে তাকিয়ে মণ্ড একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে বের করল একটি থলি। থলিটা টিপেটুপে দেখল। আঃ, নোটে ঠাসা। কড়কড়ে পঁচিশ হাজার টাকা। মান্দালয়ে চুনি বিক্রি করে পেয়েছে।

'একটু হিসেব করে চললে এখন বাকি জীবনটা পায়ের ওপর পা তুলে আরামে কাটাব।' মণ্ড নিজের মনে বলল। 'মণ্ড বোকা, চিরকাল কেবল ঠকেই এসেছে। তাই না? এখন কেমন? চোর ডাকাতকে ফাঁকি দিলাম এবং অতগুলো পাওনাদারকে বেবাক কলা দেখালাম। কাউকে একটি পয়সা ধার শোধ করতে হল না।'

দারোগাকে মণ্ড নিছক মিথ্যে কথা বলেনি। স্টিমারে ঐ গ্রামের যাত্রীদেরই কারো কাছে ছিল তার চুনি। তবে লোকটি যে স্বয়ং মণ্ড তা কে ভাববে!